# ফেরদৌসী-চরিত।

( সুপ্রসিদ্ধ পারস্য মহাকাব্য "শাহ্‌নামা"-
রচয়িতা গজনীরাজকবি ফেরদৌসীর
জীবন বৃত্তান্ত। )

শ্রীমোজাম্মেল হক্-প্রণীত।

# FERDAUSI CHARITA

OR

## THE LIFE OF FERDAUSI.

THE POET LAUREATE

*of*

GHIZNI

*BY*

MOZAMMEL HUQUE
Author of Maharsi Mansur, Apurva-Darsana,
Kusumanjali, Jubilee Sangita, Padya
Sisksha PART I & II, &c.

৪—কড়েয়া গোরস্থান রোড্; কলিকাতা।
রেয়াজ-উল্-ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেযাজ উদ্দীন আহ্‌মদ কর্তৃক মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

1৪৯৭.

# উৎসর্গ পত্র।

যে মহাত্মার পবিত্র নামে হৃদয় আনন্দ-রসে
আপ্লুত হয়, যিনি অমায়িক, সদালাপী,
মিষ্টভাষী ও সদ্‌গুণ সমূহের আধার
ছিলেন, সেই বঙ্গীয় মোস্‌লেম সমা-
জের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন ডভ্‌টন
ও সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ
দ্বয়ের স্বর্গগত সুযোগ্য
আরবী ও পারস্যা-
ধ্যাপক ভক্তিভাজন
মাননীয়
জনাব মৌলবী মেয়ারাজ উদ্দীন আহ্‌মদ
সাহেবের স্মরণোদ্দেশে
এই
ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানি
আন্তরিক
ভক্তি ও শ্রদ্ধা
সহ
তদীয় পবিত্র নামে
উৎসর্গীকৃত
হইল।

# বিজ্ঞাপন।

"মহর্ষি মন্সুর" প্রচারিত হওয়ার পর অনেক সহৃদয় পাঠক এই পুস্তকের জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু এতদিন নানা কারণে তাঁহাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে পরম করুণাময় বিশ্ব-বিধাতার অপার অনুগ্রহে এবং তাঁহার প্রিয়তম পবিত্র প্রেরিত পুরুষপ্রবরের অনুকম্পায় ফেরদৌসী-চরিত বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীর কর-কমলে সাদরে সমর্পণ করিতেছি। তাঁহারা কৃপা বিতরণ পুরঃসর গ্রন্থের বিষয়, ভাব ও ভাষাগত ভ্রমপ্রমাদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া মহৎ জীবনের মহৎ ভাব গ্রহণ ও গুণগরিমার সমাদর প্রদর্শন করিলেই আমি চরিতার্থ ও বাধিত হইব।

পরিশেষে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদর রহিম সাহেব সম্পাদিত মাসিক "মিহির" পত্রে এই প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। এক্ষণে তাহাই পরিবর্ত্তিত,ও পরিবর্দ্ধিত আকারে পুনর্মুদ্রিত হইল ; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও নূতন বিষয়ের সমাবেশ এরূপভাবে সমাহিত হইয়াছে যে,এক্ষণে ইহাকে একখানি সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

শান্তিপুর, জেলা নদীয়া।
১৩০৫ শাল, ১৫ই আশ্বিন।

শ্রীমোজাম্মেল হক্।

# শুদ্ধিপত্র।

প্রুফ সংশোধনের দোষে গ্রন্থ মধ্যে অনেকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটী গুরুতর ভুল পাঠকগণ পাঠাগ্রে সংশোধন করিয়া লইবেন।

| পৃষ্ঠা। | পংক্তি। | ভুল। | শুদ্ধ। |
|---|---|---|---|
| ৯ | ১৯ | স্বরূপা | স্বরূপ |
| ১৮ | ১৭ | আরবেরা | আরবের |
| ২৩ | ৭ | প্রতিধ্বনিতে | প্রতিধ্বনিত |
| ২৪ | ১৯ | ভ্রাতাকে | ভ্রাতাকে |
| ২৫ | ১৬ | মঙ্গল | মায়ায় |
| ২৫ | ২০ | শুভ | অশুভ |
| ৩৪ | ১৭ | অস্ত্রযথা | অস্ত্র যথা |
| ৫৬ | ১২ | মনোনিবেশন | মনোনিবেশ |
| ৬০ | ১৬ | প্রতারণ | প্রতারণা |
| ৬৩ | ২ | শান্তি | শান্তিবারি |
| ৭১ | ১৮ | ভর | ভয় |

# ফেরদৌসী-চরিত।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।



### উপক্রমণিকা।

প্রাচীন ভাষা পারসী অতি মধুর, মনোহর ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাষা। ইহার লালিত্য, সৌন্দর্য্য ও মৌলিকত্বের সহিত অন্য ভাষার তুলনা করিয়া দেখিলে, সুললিত আরব্য ও সংস্কৃত ব্যতীত অপর একটীও সমকক্ষতায় দণ্ডায়মান হইতে পারে না। এই অনন্যসাধারণ কারণ বশতই পারসী ভাষা সভ্য সমাজে সমাদৃত ও জগৎ-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহার সাহিত্য-শাখা অতি বিশাল ও সুদূর-প্রসারিত। সেই সুধাময় ফল, সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার ফুল, ও স্নিগ্ধ সুখপ্রদ ছায়া সমন্বিত শাখাতলে উপবেশন করিলে অজ্ঞান জ্ঞানভূষিত, সন্তপ্তের তাপ বিদূরিত, দুর্নীতিজ্ঞ নীতিপরায়ণ, ভীরু উৎসাহশীল ও নীরস হৃদয় মধুর রসাভিষিক্ত হইয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই ভাষায় যত মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, অন্য কোনও ভাষায় তাদৃশ নাই। সুতরাং ইহাকে বিবিধ সদ্গ্রন্থের আকর বলা যাইতে পারে। সেই আকরের অদ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময় মহামূল্য কোহিনুর শাহ্‌নামা। শাহ্‌নামার তুল্য চিত্ত-চমৎকারী, হৃদয়োন্মাদক সুবৃহৎ ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ অতি বিরল। সেই জন্যই আজ পৃথিবীর সভ্য সমাজে শাহ্‌নামার এত আদর, এত গৌরব। এমন কোন সভ্য জাতি নাই, শাহ্‌নামা যে জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডারের শোভাবর্দ্ধন করে নাই, এমন কোন সভ্য সমাজ নাই, যাঁহারা ইহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ও অপূর্ব্ব লালিত্যে মুগ্ধ নহেন। তাই বলিতেছি, যত দিন জগৎ সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত থাকিবে, কবি ও কাব্যের সম্মান থাকিবে, পারস্য সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন কোনক্রমেই ইহার চিরন্তন মর্য্যাদার অনুমাত্রও অপচয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে শাহ্‌নামা কি? তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। এই গ্রন্থে প্রাচীন পারস্যের ইতিবৃত্ত, আদ্যোপান্ত কাব্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে তদ্দেশীয় পূর্ব্বতন নৃপতিবৃন্দের কীর্ত্তিকলাপ, আচার-ব্যবহার, সমাজ-সভ্যতা, সমর-কৌশল, শাসন-

প্রণালী, লোক-চরিত্র প্রভৃতি অবশ্য-জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়; সুতরাং ইহাকে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের সুবৃহৎ দর্পণ বলা যাইতে পারে। পাঠক এতৎ পাঠে যতই অগ্রসর হইবেন, ততই নব-রসের জীবন্ত প্রতিমা সকল দর্শনে কখন করুণ-রসে দ্রবীভূত হইয়া অজস্র ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন, কখন যুবক-যুবতীর পবিত্র প্রেমালাপ শুনিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিবেন, কখন বীরের শৌর্য্য-বীর্য্য অবলোকনে বীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া অতুল উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিবেন, কখন বা পাপের বীভৎস কালিমাময় চিত্র দর্শনে স্তম্ভিত, ভীত ও বিস্মিত হইয়া অধোবদনে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিবেন, ইহা আমরা অবলীলাক্রমে উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি। ফলতঃ শাহ্‌নামা যে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকেরই সম্যক সন্তোষদায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই মহাগ্রন্থ ষষ্টি সহস্র শ্লোকে গ্রথিত; রচয়িতা মহামনস্বী কবিবর মওলানা শেখ আবুল কাসেম ফেরদৌসী। ফেরদৌসী পারস্য-সাহিত্য-গগনে সংখ্যাতীত নক্ষত্র মধ্যস্থিত সমুজ্জ্বল পূর্ণ চন্দ্র স্বরূপ এবং তাঁহার কবিতামালা কাব্য জগতে নন্দন-কাননের পারিজাত পুষ্প স্বরূপ। তাঁহার মহাকাব্য শাহ্‌নামা সমুজ্জ্বল রত্ন-খনি হইতেও

শ্রেষ্ঠ। যে কাব্যের এত গুণ, এত খ্যাতি, এত গৌরব; যে কবির এত সম্মান, এত আদর, এত প্রতিপত্তি, যিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে "কীর্ত্তি যস্য স জীবতি" এই মহাবাক্যের জ্বলন্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহাকে ইউরোপীয় মনস্বীগণ প্রাচ্যরাজ্যের হোমর (Homer of the East) নামে অভিহিত করিয়াছেন, সময়ের বিবর্ত্তনে যিনি ইংলণ্ডের কবি স্পেন্সার ও ইটালির কবি দান্তের জীবনের অবস্থাভাগী হইয়াছিলেন, চরিত্র বর্ণনে যিনি কোন কোন স্থলে মিল্টন-শেক্স্পীয়র হইতেও সিদ্ধহস্ত, যিনি স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব বলে নবরসে গঠিত করিয়া ভুবনবিখ্যাত শাহ্‌নামার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, (১) সেই কবিকুল-শিরোমণি অমর পুরুষ মহাত্মা ফেরদৌসীর অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী অবগত হইবার জন্য কাহার না ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মিতে পারে?

ফেরদৌসীর বাল্য জীবনের ইতিহাস সন্তোষ জনকরূপে অবগত হইবার কোন উপায় নাই; তাঁহার সাহিত্য-জীবন বৈচিত্র্যময় ঘটনাপুঞ্জে পরিপূর্ণ। সেই

(১) জনৈক খ্যাতনামা বঙ্গলেখক ফেরদৌসীকে "আদিরসে তিনি বিদ্যাপতি, বিরহ বর্ণনায় তিনি ভারত চন্দ্র, এবং করুণ রসে তিনি বাল্মীকি" ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সকল ঘটনায় কবির অমানুষিক তেজস্বিতা, অতুলনীয় ধৈর্য্য, অপূর্ব্ব অধ্যবসায়, অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বিপদে অসম সাহসিকতা ও কার্য্যতৎপরতার বিষয় বিশদভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যদি তিনি ঐ সমস্ত সদ্গুণাধিকারী না হইতেন, যদি তাঁহার অন্তঃকরণ সৎ-সাহস ও কোমলত্বে সুগঠিত না হইত, তাহা হইলে তিনি পরিণামে এক জন প্রথিতনামা পণ্ডিত বলিয়া কখনই খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন না এবং সমগ্র সভ্য জগৎ তাঁহার নির্ম্মল যশের উচ্চ নিনাদে কখনই প্রতিধ্বনিত হইত না। যে সমস্ত অনিবার্য্য ঘটনা পরম্পরায় বিজড়িত হইয়া তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ বীর পুরুষের ন্যায় স্বীয় শুভ সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করত গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আমরা তৎসমুদয়ের যথাশক্তি বিশ্লেষণ সহকারে তাঁহার শিক্ষাপ্রদ জীবন-কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

—০—

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### জন্মবৃত্তান্ত ও বিদ্যাশিক্ষা।

কবিকুলশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ফেরদৌসী পারস্যের অন্তর্গত খোরাসান প্রদেশস্থ তুস্ নগরে ৯৪০ খৃষ্টাব্দে জন্ম পরি-

গ্রহ করেন। এই জন্য তিনি ফেরদৌসী তুসী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু ফেরদৌসী ইহার প্রকৃত নাম নহে। ইহা তাঁহার একটী উপাধি মাত্র। একদা গজনি-অধিপতি অমিততেজা সুলতান মাহ্‌মুদ তাঁহার স্বর্গ-সুধা-নিস্যন্দিনী অপূর্ব্ব কবিতামালা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করেন এবং তদীয় গুণগ্রাহী সভাসদবর্গ বিমুগ্ধ হইয়া কবিকে শতমুখে ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হন। ইহাতেই গজনীশ্বর মাহ্‌মুদ তাঁহাকে এই "ফেরদৌসী" নামে অভিহিত করেন। ফেরদৌসী শব্দের অর্থ স্বর্গীয়। এইরূপে সুলতান এবং তদীয় অমাত্যবর্গ কর্ত্তৃক তিনি আরও বিবিধ গৌরবান্বিত নামে বিভূষিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণতঃ তিনি ফেরদৌসী নামেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন; এবং অদ্যাবধি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই মনোমোহন আখ্যাতেই পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন।

ফেরদৌসীর প্রকৃত নাম আবু-অল কাসেম (১) যে

(১) দৌলত শাহ কৃত "পারসিক কবিদিগের জীবনী" গ্রন্থে ফেরদৌসী যথার্থ নাম হাসান এবং তাঁহার পিতার নাম ইস্‌হাক শরিফ শাহ্। বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই শরিফ শাহ আবার তুস্ নগরের

পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা বর্দ্ধিষ্ণু ও বিশিষ্ট ধন সম্পত্তিশালী না হইলেও নিতান্ত অসম্ভ্রান্ত ছিল না; যাহাতে আপনাদিগের শিশুসন্তান শৈশবে সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে উৎকৃষ্টতর জীবন লাভ করত সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হয়, এই পরিবারের তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বিশেষতঃ ফেরদৌসীর পিতা মওলানা আহ্‌মদ এক জন সদ্বিদ্বান, সম্ভ্রান্ত ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন। সমাজে তাঁহার সম্মানও কম ছিল না। সুতরাং তাঁহার পুত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যৎ কালে আশ্চর্য্য শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? এইরূপ কথিত আছে যে, যে দিবস ফেরদৌসী ভূমিষ্ঠ হয়েন, তাহার পূর্ব্ব রজনীতে তাঁহার পিতা এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন (১) সন্দর্শন করেন। সেই

একটী বাগানে মালীর কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, ইহাও লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই মত যে কতদূর সমীচীন, বিজ্ঞমণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন।

(১) জগতের মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বসূচী স্বরূপ এইরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে সেই সমস্ত ঘটনার অধিকাংশ যে অনেক স্থলে সত্যমূলক, তাহার আর সংশয় নাই।

স্বপ্নটী এইরূপ,—তিনি নিদ্রাবেশে দেখিলেন, যেন পশ্চিম দিক হইতে কি এক অভূতপূর্ব্ব অস্ফুট মধুর ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া অনিল নিঃস্বনে তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সেই অমৃতবর্ষী ঝঙ্কার অপার্থিব, অতুলনীয় ও অত্যদ্ভুত, তিনি জীবনে কখন সেরূপ শুনেন নাই, ধরাধামে তাহা সম্ভবে না, বীণাবেণু সে· স্বর জানেনা। অনন্তর সেই স্বর লহরী সহযোগে চতুর্দ্দিক শব্দায়মান করিয়া অসংখ্য সাধুবাদ হইতে লাগিল, যেন স্বর্গমর্ত্ত্যে ফুল খেলিতে লাগিল। তিনি এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক দুই হস্ত তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার আর নিদ্রা আসিল না, উদ্বিগ্নচিত্তে ত্রিযামার অবশিষ্ট সময় জাগ্রত অবস্থায় কাটাইলেন। পরে প্রত্যূষ কালে যথারীতি, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্বপ্নের ফলশ্রুতি বাসনায় কোন শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গমন করেন। এই ব্যক্তি ইস্‌লাম ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ও গভীর তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ফেরদৌসী-জনককে সম্বোধন করিয়া প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই; স্বপ্নের ফল অতি সন্তোষজনক, যে সুকুমার শিশু শুভ লগ্নে তোমার গৃহের

শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে, কালক্রমে তাহার সুবিমল যশো-শশধরের সমুজ্জ্বল প্রভায় বিশ্ব-ভূমণ্ডল প্রতিভাসিত হইবে। জগদীশ্বরের কৃপায় সে এক জন শ্রেষ্ঠ কবি হইবে, তাহার নিরুপম কাব্যামৃত পানে মানবগণ তৃপ্তিলাভ করত চির-দিন তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে, তুমি ধন্য হইবে।"

এই শুভজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতার আনন্দের সীমা রহিল না; আহ্লাদে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল; সাহসে বুক ভরিয়া গেল, স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা তাঁহার বদন-মণ্ডলে ক্রীড়া করিতে লাগিল। আজ যেন তিনি কত ধনরত্ন, কত মণি-মাণিক্য লাভ করিলেন। না করিবেনই বা কেন? জগদীশ্বরের প্রসাদে যে চিরানন্দদায়ক পুত্র-প্রবর আজ প্রাপ্ত হইলেন, মণিমাণিক্য কি? মণি মাণিক্যের ভাণ্ডার হইতেও কি তাহা শ্রেষ্ঠ ও বাঞ্ছনীয় নহে? ফলতঃ এ জগতে এতাদৃশ শুভাদৃষ্ট অতি অল্প লোকেরই ঘটিয়া থাকে।

অতঃপর ফেরদৌসীর পিতা মওলানা আহ্মদ স্বপ্ন-ভাবিত উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিয়া পরম যত্নে সেই নবজাত সুকুমার শিশুর লালন পালনে মনোনিবেশ করিলেন। জননীর কোমল হস্তের গঠনে ও পিতার অক্লান্ত তীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধানে কুমার শুক্ল পক্ষের শশী-কলায়

ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, যথাকালে বিদ্যাশিক্ষার্থ নিয়োজিত করা হইল। স্বয়ং মওলানা সাহেব পুত্রের শিক্ষাগুরু স্থানীয় হইলেন। সুতরাং শিশুর প্রকৃতিগত ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষার সহিত তদীয় শিক্ষা-কার্য্য চলিতে লাগিল। ক্রমে যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে চলিল, ফেরদৌসীর শিক্ষানুরাগ ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিল। এবং স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বিনী প্রতিভা-বলে ও পিতার সুপ্রণালীবদ্ধ শিক্ষাদান-পদ্ধতি প্রভাবে অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্ব বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করত অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতাপন্ন হইলেন।

তুস্ নগরের পাদদেশে একটী নদী প্রবাহিত ছিল। প্রতি বৎসর বর্ষা সমাগমে তাঁহার জলরাশি স্ফীত হইয়া সমগ্র নগর প্লাবিত করিত। তাঁহাতে নগরবাসিগণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট ও সমূহ ক্ষতি হইত এবং দীনদুঃখী-দিগের দুর্গতির ইয়ত্তা থাকিত না। পশুপাল খাদ্যাভাবে পীড়িত, ও জলস্রোতে কত গৃহ ভূপতিত হইয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত হইত। রাজা বা রাজপ্রতিনিধির আদৌ সে দিকে দৃষ্টি বা যত্ন ছিল না। কিন্তু তদবলোকনে করুণ-হৃদয় ফেরদৌসীর কোমল মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই সেই দৈব উৎপাত নিবারণার্থ বিজনে

চিন্তা করিতেন। কিন্তু নিরুপায়—সাধ্যের অতীত। দরিদ্রের মহৎ কার্য্যের সঙ্কল্প, সঙ্কল্পেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, কার্য্যে পরিণত হওয়া বড় কঠিন কথা! সেই জন্য তিনি নিরন্তর ক্ষুণ্ণভাবে বলিতেন "যদি পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে কখন আশানুরূপ ধনোপার্জ্জন করিতে পারি, তবে এই নিদারুণ ক্লেশের হাত হইতে নগরবাসী প্রজা সাধারণকে রক্ষা করিব, প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নদীতটে এরূপ এক সুদৃঢ় ও উন্নত বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিব যে, জলরাশি সহস্র গুণে উচ্ছ্বসিত হইলেও যেন নগরের কোনরূপে অনিষ্ট সাধন না করিতে পারে।" দরিদ্র ফেরদৌসী মহত্তের উচ্চাভিলাষ, এই শুভ সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### শাহনামা গ্রন্থোৎপত্তির মূল সূত্র।

প্রাচীন ইতিবৃত্তকারদিগের লিখিত বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, পারস্যের সাসানবংশীয় শেষ নরপতি

এজ্‌দিগোর্দ্দ(১)অতীব বিচক্ষণ, সদ্‌গুণশালী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য সংশ্লিষ্ট রাজ-উপাখ্যান ও ইতিহাসাদি সংগ্রহে প্রভূত প্রয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে পারস্যরাজ কয়ূ-মোর্সের রাজত্বকাল হইতে মহারাজ খোস্‌রুর সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহার নাম "সায়ের-অল-মুলুক" বা বোস্তাঁনামা। বোস্তাঁনামা অন্যান্য গ্রন্থের সহিত রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছিল। অনন্তর যখন আরবীয়গণ মহামতি খলিফা হজরত ওমরের কর্ত্তৃত্বাধীনে ইস্‌লামের উন্নতি ও বিস্তৃতি মানসে জ্বলন্ত উৎসাহে ও অপ্রতিহার্য্য প্রতাপে পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন, সেই সময়ে ইহা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সহিত আরবভূমে নীত হয়। আরব হইতে ইহা ক্রমান্বয়ে ইথীয়োপিয়া (২), ভারতবর্ষ ও খোরা-

(১) ইঁনি সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিচারক পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁর শেষ বংশধর, হিজরীর প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে রাজত্ব করিতেন। ইঁনি আরবের অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা হজরত ওমর প্রেরিত বিজয়-বাহিনী কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হন।

(২) মিসরের দক্ষিণস্থ জনপদ,—আবিসিনিয়া ও পূর্ব্ব সুদান।

সান প্রদেশে আইসে। পরে সামানী বংশের জনৈক বিদ্যোৎসাহী নরপতি তৎকালের প্রসিদ্ধ কবি দকিকীকে এই গ্রন্থ কাব্যাকারে রচনা করিতে অনুমতি করেন। কবি দকিকী রাজাজ্ঞায় হৃষ্টচিত্তে গ্রন্থরচনায় মনোযোগী হয়েন। কিন্তু তিনি প্রভূত পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে শীঘ্রই সহস্র কবিতা প্রস্তুত করার পর, গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ আপনার দুর্বৃত্ত পরিচারক কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায়, গ্রন্থ-রচনা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, বহুকাল যাবত অপর কেহই উক্ত দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

অনন্তর অদ্বিতীয় তেজোবীর্য্যশালী দিগ্বিজয়ী ভূপতি সুলতান মাহ্‌মুদ সবক্তগীন, যিনি সমগ্র পৃথিবীর এক-চ্ছত্রাধিপতি হইবার উচ্চাভিলাষে সুদূরবর্ত্তী তাইগ্রীসের উপকূল ভাগ হইতে নির্ম্মল সলিলা গঙ্গা নদীর শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা ভূমি পর্য্যন্ত এবং তাতারের তুষার ধবলিত উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বতমালা হইতে ভারত মহাসমুদ্রের বেলাভূমি পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, স্বীয় রাজত্বের গৌরব বৃদ্ধি অভিপ্রায়ে পারস্য দেশীয় প্রাচীন রাজাদিগের এক ইতিহাস সঙ্কলন করিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি স্বয়ং বিদ্বান্ ছিলেন এবং বিদ্বানেরও অতিশয় সম্মান করিতেন; তজ্জন্য তাঁহার রাজসভা অনেক কবি এবং পণ্ডিতমণ্ডলীতে

সুশোভিত ছিল। তিনি স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করণার্থ সেই সমস্ত পণ্ডিতকে অনুমতি করেন। তাঁহারা যৎকালে এক যোগে এই বহু শ্রমসাধ্য কঠিন কার্য্য সম্পাদনার্থ ঘটনা পরম্পরার সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে দৈবক্রমে এক খণ্ড বোস্তাঁনামা সুলতান মাহ্‌মুদের হস্তগত হয়। সুলতান সেই অজ্ঞাত ও অশ্রুতপূর্ব্ব গ্রন্থ দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত ও অত্যন্ত পুলকিত হয়েন এবং তন্মধ্য হইতে সাতটী বিষয় নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সাত জন রাজকবিকে রচনা করিতে প্রদান করেন, উদ্দেশ্য—কবি সপ্তমের মধ্যে যিনি রচনার পারিপাট্যে, শব্দবিন্যাসে ও মাধুর্য্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হইবেন, সুলতান তাঁহারই উপর গ্রন্থ প্রণয়নের ভারার্পণ করিবেন। এই পরীক্ষাস্থলে রাজকবি আন্‌সারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হন। তিনি রোস্তম ও সোহ্‌রাবের উপাখ্যান এরূপ হৃদয়গ্রাহিণী ওজস্বিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, সুলতান মাহ্‌মুদ তদীয় অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সুচারু লিপিকুশলতায় বিমুগ্ধ হইয়া প্রসন্নচিত্তে সমগ্র গ্রন্থ তাঁহাকেই রচনা করিতে নিয়োজিত করিলেন।

এই সময়ে আমাদের মহাকবি ফেরদৌসী জন্মভূমি তুস্ নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তখনও তাঁহার

কবিতা-কোরক সম্যক বিকশিত হয় নাই বটে, কিন্তু স্ফুটনোন্মুখ হইতেছিল, তাঁহার মধুময়ী বীণার মনোমোহন ঝঙ্কার দিগ্‌দিগন্তর মাতাইয়া বিমানপথে উত্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু উত্থানের উদ্যম করিতেছিল। তিনি সেই নিভৃত নগরের নিভৃত ভবনে আত্মতৃপ্তি সাধনার্থ সমধিক যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কবিতা দেবীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে সৌভাগ্যসূত্রে অবগত হইলেন যে, গজনীশ্বর বিদ্যোৎসাহী মহামান্য সুলতান মাহমুদ-বিন্ সবক্তগীন অতি পুরাকালের বাদশাহগণের জীবনের কার্য্য-কলাপ ঘটিত কোন এক গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করাইতে অভিলাষ করিয়াছেন এবং সেই সুমহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গজনীরাজসভায় নানাদিগদেশ হইতে অনেকানেক ধীশক্তিসম্পন্ন বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবির আগমন হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণে ফেরদৌসীর অন্তঃকরণ আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিল; তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডল উৎসাহের উজ্জ্বলালোকে বিভাসিত হইল; কুহকিনী আশার মোহনীয় মন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি স্বয়ং ঐরূপ এক গ্রন্থ কাব্যাকারে প্রণয়ন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু হইলে কি হইবে? পুরাতত্ত্ব বিষয়ক কোন পুস্তক হস্তগত না হওয়ায় সঙ্কল্পসিদ্ধি বিষয়ে অযথা বিলম্ব ও ব্যাঘাত ঘটিতে

লাগিল। এই নিমিত্ত তিনি বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পর, মাহ্‌মুদ লস্করী নামধেয় তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট উক্ত-বিধ এক পুস্তক পাইয়া প্রফুল্লমনে কার্য্যারম্ভ করিলেন।

মহাকবি প্রথমে কেবল ফরিদূঁ ও জোহাক বাদশাহের যুদ্ধ-বিবরণ সুধাময়ী তেজস্বিনী ভাষায় রচনা করিলেন এবং তাহাতেই অবিসম্বাদিতরূপে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠাবান হইলেন; সাধারণে তাঁহার অভিনব কাব্য পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। উহা এতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, তাঁহার শব্দবিন্যাসের পারিপাট্য ও অলৌকিক কবিত্বশক্তি দেখিয়া তদ্দেশের শাসনকর্ত্তা আবু মন্‌সুর অতীব প্রীতি-লাভ করেন। তিনি ফেরদৌসীকে পুরস্কার প্রদানে উৎসাহিত ও সম্মানিত করত রাজপ্রাসাদে থাকিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে অনুমতি করিলেন। ফেরদৌসী রাজাশ্রয়ে থাকিয়া পুস্তক লিখিতে আদিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিল। তাঁহার উৎসাহশীল আশ্রয়দাতা রাজ্যাধিপতি আবু মন্‌সুর অকস্মাৎ মানবলীলা সাঙ্গ করিলেন, অগত্যা মহাকবির লেখনীও মহাক্ষোভে কিছুকাল অচলভাব ধারণ করিল।

—০:::০—

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### কবির গজনী যাত্রা ও পথিমধ্যে ব্যাঘাত প্রাপ্তি।

ফেরদৌসীর গুণগরিমা এক্ষণে চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার নবজাত কাব্য-কাননের সুরভিত সমীরণ দেশদেশান্তরে প্রবাহিত হইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেছে। দীনের কুটীরে, মধ্যবিত্তের ভবনে, রাজার প্রাসাদে আজ ফেরদৌসী সমভাবে বিদ্যমান—সর্ব্বত্রই তাঁহার নির্ম্মল যশোগীতি প্রতিধ্বনিতে হইতেছে। এতদপেক্ষা পরম সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? গজনীপতি সুলতান মাহ্‌মুদও তাঁহার অনন্যদুষ্কর কবিত্ব শক্তির প্রশংসাবাদ ইতিপূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রবণ অবধি তিনি সেই অতুলনীয় কীর্ত্তিমান অমর কবিকে গজনীতে আনাইয়া, আপনার রাজসভা সমালঙ্কৃত করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সুযোগ সমুপস্থিত, সুলতান ফেরদৌসীকে গজনী-রাজসভায় পাঠাইয়া দিবার জন্য তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে অনুজ্ঞা-পত্র প্রেরণ করিলেন। ফেরদৌসী সেই লিপির মর্ম্মাবগত হইয়া অভীষ্টসিদ্ধির মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত জ্ঞানে পরম পুলকি-

তান্তরে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং আপনার আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত গ্রহণ পূর্ব্বক অগৌণে গজনী যাত্রা করিলেন।

মহাকবির গজনী গমন ও তাঁহার জন্মভূমিতে অবস্থান কালের বিবরণ পুস্তকান্তরে অন্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যদিও উহা যথার্থ বলিয়া প্রামাণ্য নহে, ন্যায়দর্শী জগৎ উহা সম্ভব ও সমূলক বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে, এবং আমরাও উহার পক্ষপাতী নহি, তথাপি সেই বৃত্তান্ত সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পশ্চাৎ লিপিবদ্ধ করিলাম।

এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, ফেরদৌসী এবং তাঁহার ভ্রাতা মহ্‌মুদ মূলে তুস্‌ নগরের জনৈক কৃষক সন্তান ছিলেন এবং উভয়েই শ্রমসাধ্য কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঘটনাক্রমে কোন প্রতিবাসীর সহিত তাঁহাদের ভয়ানক বিরোধ উপস্থিত হয়; সেই প্রবল শত্রুর ভীষণ পীড়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া, অস্থিরচিত্তে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তদনুসারে তিনি একদা বিনয় ও কাতরতার সহিত আপন ভ্রাতাকে বলেন, "ভাই, শত্রুর অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে; ক্রমা-

গত এত উৎপীড়ন, এত অবমাননা সহিয়া আর বাস-করা যায় না। পদে পদে শত্রু-ভয়, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতেও শঙ্কা উপস্থিত হয়। কোন্ দিন বা জীবনের আশাও ত্যাগ করিতে হইবে। যেখানে সুখ-শান্তি-স্বাস্থ্য নাই, কাহার সহানুভূতি বা সাহায্য পাইবার উপায় নাই, সেস্থলে বাস করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। সেইস্থলে থাকা, আর শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যে থাকা, উভয়ই সমান। তাই বলিতেছি, যদি জীবনের অবশিষ্ট সময় নির্ব্বিঘ্নে কাটাইতে বাসনা করেন, তবে চলুন, আমরা উভয়েই এই অশান্তিময় অরাজক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন রাজ্যে প্রস্থান করি।" মহম্মুদ ভ্রাতার প্রস্তাবে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অধিকন্তু সে বিষয়ে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে লাগিলেন। কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ফেরদৌসী কিছুতেই বিচলিত হইলেন না; স্বদেশের মঙ্গল ও ভ্রাতার স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া, একাকী আত্মীয়-বন্ধুহীন অসহায় অবস্থায় জন্মস্থান তুস্ নগর হইতে গজনী অভিমুখে বহির্গত হইলেন।

এ জগতে শুভ কার্য্যের অন্তরায় অনেক! শুভের পশ্চাতে অশুভ, আলোকের পশ্চাতে অন্ধকারের ন্যায় প্রতি-

নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। তুমি বুঝিতে পারিবে না, জানিতে পারিবে না, দেখিতে পাইবে না, তোমার সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে কোন্ সূত্রে যে অনিষ্টের জাল বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, কে বলিতে পারে? যখন ফেরদৌসীকে তুস্ হইতে গজনীতে প্রেরণার্থ তদ্দেশীয় শাসনকর্ত্তাকে পত্র লিখিত হয়, সেই সময় বদরউদ্দীন নামক জনৈক সভাসদ সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন। বদরউদ্দীনের সহিত অন্যতম রাজকবি আন্সরী ও রুদকীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি গোপনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "দেখিতেছ কি, তুস্ নগরে ফেরদৌসী নামধেয় এক প্রসিদ্ধ কবি আছেন; সম্রাট তাঁহাকে গজনীতে আনয়নার্থ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আসিলে শাহনামা প্রণয়ন পূর্ব্বক বাদশাহের অনুগ্রহ ভাজন হইয়া চিরদিন সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং তদ্দ্বারা তোমাদের ভাবী উন্নতির পথ একবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তোমরা আমার পরম বন্ধু, বন্ধুর ক্ষতিতে বন্ধুর অন্তরে আঘাত লাগে। এই জন্যই পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছি, যদি আত্মোন্নতির পথ পরিষ্কার রাখিতে চাও, তবে অবিলম্বে ইহার প্রতিবিধান কর।

কবিদ্বয় এই অশিব সংবাদ শ্রবণে অতীব চিন্তিত হইলেন। ভাবী অনিষ্টের বিষয় ভাবিয়া তাঁহাদের হৃদয় শুষ্ক হইতে লাগিল; কি করিবেন, কিরূপেই বা ফেরদৌসীকে আসিতে নিরস্ত করা যায়! কাহার স্কন্ধে দুইটী মস্তক আছে যে, সম্রাটের সম্মুখে ইহার প্রস্তাব করে!! এইরূপ বিবিধ চিন্তায় তাঁহারা জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বহুল গবেষণার পর ফেরদৌসীর নিকটে এক সুচতুর চর প্রেরণ করিলেন। চর পথিমধ্যে মহাকবির সহিত সম্মিলিত হইয়া বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন আরম্ভ করিল, পরে ফেরদৌসীর গজনী গমন প্রসঙ্গে কবিদ্বয়ের শিক্ষানুযায়ী সংপূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া কহিল, ''মহাশয়! শুনিয়াছি, সম্রাটের মনের গতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে উৎসাহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। গ্রন্থরচনায় যে অনুরাগ ছিল, তাহা আর নাই। এখন তিনি ধনী-জন-সুলভ বিলাস-ব্যসনেই দিনপাত করিতেছেন। আপনি যে আশায় উৎসাহিত হইয়া পদব্রজে কষ্টে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতেছেন, সে কষ্টের পুরস্কারের প্রত্যাশা নাই—যাইলে পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। অতএব আনুপূর্ব্বিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেস্থলে

আর না যাওয়াই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। তবে আপনার যাহা অভিরুচি, তাহাই করুন।”

মিষ্টভাষী চতুর চর ঐ সমস্ত কথা এরূপ কৌশলের সহিত মধুর বাক্যে ব্যক্ত করিল যে, সরলচেতা ফেরদৌসীর তাহাতে সংপূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। তিনি মর্ম্মাহত হইলেন, হতাশে মুখমণ্ডল মলিনভাব ধারণ করিল। ভাবিলেন, বড় লোকের মন, মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইবার কথাই বটে! আবার ভাবিলেন, ইহার বাক্য যে বাস্তবিকই সত্য, তাহারই বা প্রমাণ কি? এক জন অপরিচিত আগন্তুকের বাক্যে সহসা আস্থা স্থাপন করাও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এইরূপ সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইয়া অবশেষে তিনি কর্ত্তব্য অবধারণার্থ নিকটস্থ এক পান্থশালায় কিছুদিন অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন।

ফেরদৌসী পান্থনিবাসে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে ঘটনাসূত্রে কবি আনসারি ও রুদকীর সহিত বদরউদ্দীনের মনোমালিন্য জন্মিল। পূর্ব্বে তিনি বন্ধুত্বের অনুরোধে যে কার্য্য সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার চক্ষে অতীব অন্যায় ও অপকর্ম্ম বলিয়া পরিলক্ষিত হইতে লাগিল; ভয়ানক অনুশোচ-

নায় তাঁহার অন্তর পুড়িতে লাগিল। ভাবিলেন, "পৃথিবীতে কোন কার্য্যই গোপনে থাকে না; যতই সাবধানে চলনা কেন, উহা এক দিন না এক দিন প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং কোনরূপে যদি ফেরদৌসীর আগমনে বাধা প্রদানের প্রতারণার কথা বাদশাহের কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে আমার বিপদের ইয়ত্তা থাকিবে না। সাধ করিয়া সুখে বঞ্চিত হইতে কে চাহে? অতএব অবিলম্বে ইহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।" বদরউদ্দীন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ফেরদৌসীকে আহ্বানার্থ গুপ্তভাবে এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত যথাকালে পান্থগৃহে উপনীত হইয়া কবির নিকটে আদ্যোপান্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। তখন ফেরদৌসী, কবি আন্সারী ও রুদকীর বিজাতীয় বৈরিতার কথা অবগত হইয়া যুগপৎ বিষাদিত ও হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর সর্ব্বকার্য্যের অধিনায়ক সেই বিশ্বস্রষ্টা পরাৎপর পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া পুনর্ব্বার গজনীর উদ্দেশে বহির্গত হইলেন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### গজনীরাজকবিগণের সহিত ফেরদৌসীর কাব্যালাপ ও তাঁহাদের সহিত অবস্থান।

অপার উৎসাহের আকর্ষণ বশে অক্লান্ত পরিশ্রমে দিবা রজনী চলিয়া ফেরদৌসী গজনী নগরীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। তিনি দূর হইতে রাজধানীর রমণীয় শোভা-সমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত ও পরম পুলকিত হইলেন। রাজ-প্রাসাদ, সাধারণ হর্ম্ম্যশ্রেণী, মস্‌জিদ, মিনার, দুর্গ এবং অপরাপর দর্শনীয় বিষয়ের অভিনবত্বে মুগ্ধ হইয়া, তিনি গজনীকে সুখধাম সুরপুর সম বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। অতঃপর মনে মনে বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে যথাকালে নগরীর উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন, এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে পথপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে আন্‌সারী, আস্‌জদী ও ফররখী, গজনীর এই প্রতিষ্ঠাবান রাজকবিত্রয় সমীরণ সেবনার্থ নগর বহির্ভাগে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অদূরে এক কুসুমোদ্যান

মধ্যে সুরভিত সুশীতল মারুত হিল্লোলে নানাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করত আনন্দে পাদচারণ করিতেছিলেন। ফেরদৌসী তদ্দৃষ্টে গাত্রোত্থান করিয়া মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে উদ্যানাভিমুখে চলিলেন। তাহাতে কবিত্রয়ের মনে বড়ই অসন্তোষ ও বিরক্তির চিহ্ন প্রকটিত হইল। সেই অপরিচিত পুরুষকে আসিতে দেখিয়া একজন ভ্রূ-ভঙ্গিমা সহকারে কহিলেন, "এমন বিশুদ্ধ আমোদ উপ-ভোগের সময়ে অপরের সহিত বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ করিতে প্রাণ কিছুতেই প্রস্তুত নহে। আগন্তুক আসলেই আমাদের আমোদ ভঙ্গ হইবে, সুতরাং সেই অসহ্য জ্বালার নিরাকরণ জন্য উদ্যান-প্রবেশ-পূর্ব্বেই আমি উহাকে দূর করিয়া দিব।" বিচক্ষণ আন্সারী এই অসৌজন্য-সূচক প্রস্তাব শ্রবণে বলিলেন, "ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করিও না, তাহা নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বরেরই শোভা পায়। জ্ঞানী ব্যক্তির ঈদৃশ আচরণ দূরপনেয় কলঙ্কের কথা—প্রকাশ হইলে লজ্জায় মুখ অবনত করিতে হইবে। আর সহসা এক ব্যক্তির অন্তরে কষ্ট দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। তবে যদি উহাকে তাড়াইতেই হয়, আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, সোজা পথ পড়িয়া রহি-য়াছে; কৌশলে অথচ ভদ্রতা রক্ষার সহিত অভীষ্ট

সফল হইবে। আইস, আমরা তিন জনে গভীর ভাব-পূর্ণ তিন চরণ কবিতা প্রস্তুত করিয়া রাখি, আগন্তুক যদি তাহার ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চতুর্থ পদ পূর্ণ করিয়া দিতে সক্ষম হয়, তবে উদ্যান-প্রবেশাধিকার পাইবে, আমরা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিব; অন্যথা বিতাড়িত হইবে।"

আন্‌সারী গর্ব্ব-স্ফীতবক্ষে ইহাই বলিয়া নীরব হইলে, অপর কবিদ্বয়ও সেই পরামর্শ সুযুক্তিসঙ্গত এবং কার্য্য-সিদ্ধির সহজ উপায় বিবেচনা করিলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তিন জনেই কোন রমণীর সৌন্দর্য্যের উপর লক্ষ্য করত হৃষ্টচিত্তে তিন চরণ শ্লোক রচনা করিলেন এবং পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, আগন্তুক সাধারণ ব্যক্তি; উহার বিদ্যাবুদ্ধিও অবশ্য তাদৃশী হইবে। সুতরাং এই কঠিন প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করা তাহার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। অপর এক জন সগর্ব্বে কহিলেন, "বিদ্বান্ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী হইলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে এরূপ একটী গুরুতর বিষয় সমাধা করা কি সহজসাধ্য বিবেচনা কর? কাব্য-কানন বিচরণ করা স্বল্প তপস্যার কার্য্য নহে"! কবিত্রয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ফেরদৌসী

উপস্থিত হইয়া নম্রতার সহিত শ্রমক্ষীণ স্বরে অভিবাদন করিলেন। তখন তাঁহারা অভিবাদনের যথারীতি প্রত্যভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়। এটী রাজোদ্যান; এস্থলে আমরা কবিত্ব-শক্তির উৎকর্ষ বিধানার্থ উপস্থিত পাদপূরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত আছি। সাধারণ জনগণের এখানে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। তবে যিনি আমাদের ন্যায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে উপস্থিত পাদপূরণে সফলকাম হইতে পারেন; তিনিই এই উদ্যান মধ্যে আমাদের সহবাসে থাকিতে সক্ষম হন; অন্যথা তাঁহাকে ক্ষুণ্ণমনে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে হয়। অতএব এই প্রথানুযায়ী আপনি যদি আমাদের কথিত কবিতার চতুর্থ চরণ পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা হইলে উদ্যানে প্রবেশাধিকার পাইবেন—আমরা আপনাকে সাদরে গ্রহণ করিব; নতুবা এই মুহূর্ত্তেই এই-স্থান হইতে আপনাকে প্রস্থান করিতে হইবে।"

ফেরদৌসী এই কথা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন; তিনি পথিমধ্যে যত কষ্ট পাইয়াছিলেন, এখানে আসিয়া অনেক পরিমাণে তাহার লাঘব হইল; তাই মৃদুহাস্যে নম্রভাবে কহিলেন, "ইহা ত অতি উত্তম কথা; নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করাও আমার অভিপ্রেত নহে। আমি

আপনাদের অবশ্যপালনীয় নিয়ম রক্ষা করিতে সর্ব্বতো-ভাবে প্রস্তুত আছি। যদি সেই সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা পরম-কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় কৃতকার্য্য হইতে পারি, আপনাদের ন্যায় পরমার্চ্চনীয় মহাত্মাগণের পরম সুখ-কর সংসর্গ লাভে আপ্যায়িত হইব, নতুবা অবনত মস্তকে যদৃচ্ছা প্রস্থান করিব।" আগন্তুকের এই উৎসাহ-পূর্ণ সদুত্তর শ্রবণান্তর প্রথমতঃ আন্‌সারী গম্ভীরভাবে কহিলেন—

শশাঙ্ক সুন্দর নহে তব মুখ সম,

তৎপরে আস্‌জদী মৃদুহাস্যে কহিলেন—

বিমলিন তার কাছে পুষ্প মনোরম।

পরে ফররথী বলিলেন—

ভ্রূ-পাঁতি তীরের ন্যায় মর্ম্মভেদ করে,

ফেরদৌসী, বক্তার বাক্যস্ফুরণ সাঙ্গ হইতে না হইতে, মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত অম্লানবদনে আবৃত্তি করিলেন—

গেঁও বীর-অস্ত্রযথা পশুন-সমরে। (১)

(১) পাঠকগণ পশুন সহ যুদ্ধে বীরবর গেঁওর অব্যর্থ শর সন্ধানের বিষয় শাহ্‌নামা পাঠে অবগত হইতে পারিবেন।

ফেরদৌসী শ্রবণমাত্র কবিতার ভাষা ও মর্ম্মানুযায়ী চতুর্থ পদ রচনা করিয়া দিলে, মহাকবির অমানুষিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কবিত্বশক্তি দর্শনে রাজকবিত্রয়ের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা ক্ষণকাল স্থিরনেত্রে প্রস্তর প্রতিমাবৎ অচল ও নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন—মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল, অন্তর দমিয়া গেল, দর্প চূর্ণ হইল। ভাবিয়াছিলেন, "অভ্যাগতকে আগমন মাত্র মলিনমুখে প্রত্যাগমন করিতে হইবে, তাঁহাদের নির্দ্দেশিত কণ্টকাকীর্ণ কাব্য-কাননের কমনীয় কুসুম চয়ন করিতে কিছুতেই সক্ষম হইবে না।" কিন্তু ভস্মাবরণের মধ্যেও অগ্নি থাকে, বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডেও বারিবর্ষণ করে, অসুদৃশ্য কোষাভ্যন্তরেও রত্ন থাকিতে পারে, এবং অন্ধকারময় গভীর গর্ভেই মণির উদ্ভব হয়, ইহা ক্ষণকালের জন্যও একবার চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। ফলে এক্ষণে তাঁহাদের পূর্ব্বধারণা তিরোহিত হইল, দৃষ্টির অর্গলবদ্ধ বিষম ব্যবধান সরিয়া গেল। বুঝিলেন, এই বৈদেশিক পুরুষ সামান্য ব্যক্তি নহেন, বুঝিলেন, সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বপাতা ইহাঁকে অগাধ জ্ঞান, অপরিসীম পাণ্ডিত্য, এবং সর্ব্বোপরি অদ্বিতীয় কবিত্ব-শক্তির আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তখন কবিত্রয়

আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া যথোচিত সাদর সম্ভাষণের সহিত সসম্মানে ফেরদৌসীকে গ্রহণ করিলেন এবং ততোধিক যত্নে আপনাদের বাসভবনে স্থানদান করিলেন। অতঃপর ক্রমাগত বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন প্রসঙ্গে তাঁহারা ফেরদৌসীর অমানুষিক প্রতিভা ও অদ্ভুত শক্তির অধিকতর পরিচয় পাইতে লাগিলেন। পরন্তু এই পরিচয়ে মন্দভাগ্য ফেরদৌসীর আবার এক অমঙ্গলের সূত্রপাত হইল; অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল উঠিল। ফেরদৌসীর গুণপনা দর্শনে যে কবিগণের অন্তর প্রথমতঃ সদ্ভাবপূর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা শঠতা, প্রতিহিংসা ও ঈর্ষায় পরিপূরিত হইয়া গেল। পরশ্রীকাতরতার দারুণ দাবানলে তাঁহাদের হৃদয়-কানন ভস্মীভূত হইতে লাগিল। পাছে এই অপরিচিত পথিক রাজসভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, পাছে তাহার সহিত তাঁহারা প্রতিদ্বন্দিতা ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে অসমর্থ হন, পাছে তাঁহাদের চিরপ্রতিষ্ঠিত খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম খর্ব্ব হয়, কবিগণের মনে এইরূপ ভীষণ ভীতিমেঘ সঞ্চারিত হইয়া দিন দিন ঘনীভূত হইতে থাকিল। এবং এই আশঙ্কাক্রমেই তাঁহারা ফেরদৌসীকে কৌশলে রাজসভায় উপস্থিত করিতে বিরত রহিলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### সুলতান মাহ্‌মুদ কর্ত্তৃক কবির আহ্বান ও শাহ্‌নামা রচনার আদেশ।

ফেরদৌসী কবিগণের সহবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আপনাদের কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাকে বাহ্যতঃ বিবিধ প্রকারে যত্ন ও আদর দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না বটে, কিন্তু যাহাতে ফেরদৌসীর মন ভগ্নোৎসাহিত হয়, যাহাতে তিনি হতাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ করিতেই প্রবৃত্ত রহিলেন। সরলচেতা ফেরদৌসী তাঁহাদেব দুরভিসন্ধির মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হইলেন না এবং তিনি যে শত্রু-পরিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না। অথবা বুঝিলেই বা কি হইবে? আত্মীয়-স্বজন পরিশূন্য এই অনায়ত্ত স্থানে তিনি কি করিতে পারেন!! প্রভূত ক্ষমতা থাকিলেও তাহা কার্য্যকারক নহে। কিন্তু বিধাতার বিধি অন্যরূপ! যে, যে বিষয়ের চিন্তা করে, সেই সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রসাদে তাহার তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ফেরদৌসীর

মনোভিলাষ সফল হইবে না কেন? কিছুদিন থাকিতেই তাঁহার মনে বিরক্তির সহিত চৈতন্যের উদ্রেক হইল। তখন তিনি যে উদ্দেশ্য সফল কামনায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া সুদূরবর্ত্তী স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন করিবার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। পরে একদা মামক নামক গজনীশ্বরের জনৈক অমাত্যের সহিত ফেরদৌসীর পরিচয় হইল। এই ব্যক্তি গুণগ্রাহী, উদারচেতা, দয়ালু ও অতীব ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ফেরদৌসী তাঁহাকে আপনার গজনী আগমনের তাবত বৃত্তান্ত যথাযথ বিবৃত করিলেন এবং বিনয়-নম্র বচনে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া, একে একে স্বরচিত কবিতাবলী প্রদর্শন করিলেন। মামক কবির অদ্ভুত কবিত্বশক্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অপার ভাবুকতা দর্শনে এককালে বিমোহিত হইলেন এবং তন্মধ্য হইতে কতিপয় উৎকৃষ্ট কবিতা নির্ব্বাচন পূর্ব্বক স্বভবনে লইয়া গেলেন। অতঃপর অবসরক্রমে মহাকবির আগমনবার্ত্তা বাদশাহের গোচরীভূত করিয়া, সেই সমস্ত অমূল্য রত্ন স্বরূপ কবিতারাজি প্রদর্শন করিলেন। বিদ্যালঙ্কৃত-হৃদয় গুণগ্রাহী সম্রাট সুলতান মাহ্‌মুদও তৎসমুদয় পাঠে

বিমুগ্ধ হইয়া বিস্ময়াভিভূতচিত্তে রচনার লালিত্য, সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং মনে মনে সমধিক প্রীত হইয়া ফেরদৌসীকে রাজসভায় আনয়নার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন।

এদিকে মহামতি ফেরদৌসী অনুকূল সংবাদ শ্রবণে অদৃষ্টের পাষাণ অর্গল ভেদ করিয়া এতদিনে দৈব প্রসন্ন হইলেন ভাবিয়া, রাজাজ্ঞা পালন করিতে আর ক্ষণবিলম্ব করিলেন না। তিনি যথারীতি বিনয়-নম্রতার সহিত রাজভক্তি ও রাজসম্মান রক্ষা করিয়া গজনীশ্বরের বীর-ধীর-জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক মণ্ডলাপূর্ণ ভুবনবিখ্যাত রাজদরবারে উপনীত হইলেন এবং সিংহাসন-সম্মুখভাগে সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া নতভাবে দণ্ডায়মান হইলে, গজনীপতি সুলতান মাহ্‌মুদ কবিকে যথাযোগ্য আদরা ভ্যর্থনা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে কতিপয় কবিতা গ্রথিত করিতে অনুমতি করিলেন। তাহাতে মহাকবি [illegible] বিলম্বে স্বকীয় স্বাভাবিকী উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে বাদশাহের গুণগ্রাম ও রাজসভা এরূপ মনোরম শ্লোকমালায় বর্ণনা করিলেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ পণ্ডিত ও পারিষদ মণ্ডলী সংবলিত স্বয়ং বাদশাহ অতীব বিমোহিত হইলেন—কবির প্রশংসা-ধ্বনিতে সুবৃহৎ সভামণ্ডপ

শব্দায়মান হইয়া উঠিল। তখন সুলতান কবির অনন্য সাধারণ অপার্থিব গুণের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

যৎকালে কবিকুলকেশরী ফেরদৌসী গজনী নগরীতে আসিয়া সমুপস্থিত হন, সেই সময়ে রাজকবি আন্‌সারী শূরশ্রেষ্ঠ রোস্তম ও সোহ্‌রাবের অলৌকিক বীরত্ব কাহিনী কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়া সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তজ্জন্য আন্‌সারীর যশোকীর্ত্তন ও সাধুবাদ প্রদানই তাৎকালিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সাধারণ লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। ফেরদৌসী রাজসভাতেও উহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইলেন। তখন তিনিও সার্ব্বজনিক রুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া বীরবর রোস্তম ও এস্‌ফন্দিয়ারের (১) ভীষণ সমর-বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই উহা হৃদয়-গ্রাহিণী সুমধুর ভাষায় সম্পাদন করিয়া উপহার স্বরূপ মহামনস্বী মাহ্‌মুদ শাহের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সুলতান ইতিপূর্ব্বেই কবির গুণপনার পরিচয় পাইয়াছিলেন,

(১) বীর-শার্দ্দূল রোস্তম, এস্‌ফন্দিয়ার ও সোহ্‌রাবের বৃত্তান্ত শাহ্‌নামা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে এতদবলোকনে অধিকতর বিস্ময় সহকৃত আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়া হর্ষ বিস্ফারিত-লোচনে কবিকে যথেষ্ট সম্মান ও আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক "যিনি অদ্ভুত রচনা-শক্তি প্রভাবে মর্ত্ত্যে স্বর্গ-সুধা-স্রোত প্রবাহিত করিতে সক্ষম, তিনি বাস্তবিকই স্বর্গীয়" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া "ফেরদৌসী" এই গৌরবাত্মক উপাধিভূষণে সমালঙ্কৃত করত শাহ্‌নামা রচনা করিতে নিয়োজিত করিলেন। এই নিয়োগে সকলেরই সন্তোষ সাধিত হইল। সভাসদ্‌গণ সকলেই কবির রচনা নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন। অধিক কি, যাঁহার প্রশংসায় উচ্চ নিনাদে এতদিন মহানগরী গজনী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, যিনি রাজ-প্রদত্ত সম্মানের কনক কীরিট শিরে ধারণ করিয়া এতদিন স্ফীতবক্ষে কাব্য-কানন বিচরণ করিতেছিলেন, স্বয়ং সেই রাজকবি আনসারী ফেরদৌসীর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা ও অদ্ভুত রচনা-নৈপুণ্যের প্রাধান্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার পূর্ব্বক বিনা বাক্যব্যয়ে কবিতা-কুসুম চয়নে হস্ত সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইলেন।

গজনীপতি ফেরদৌসীর কাব্য-শক্তিতে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিদিন শাহ্‌নামার

যতগুলি শ্লোক রচিত হইবে, মহাকবিকে উহার প্রত্যেক কবিতায় এক এক সুবর্ণ মুদ্রা দিতে ধনাধ্যক্ষ খাজা আহ্‌মদ হোসেনকে অনুমতি করিলেন। ফেরদৌসী স্বকীয় আশানুরূপ এই রাজাজ্ঞা শ্রবণে অতীব প্রফুল্ল হইলেন; তাঁহার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি এত দিন পরে আপনার মনোরথ সফল করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার উপায় হইল, ভাবিয়া মনে মনে জগন্নিধান বিশ্বকর্ত্তাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। পরে প্রতিদিন মুদ্রা গ্রহণের অসুবিধা অনুধাবন করিয়া রাজবাক্য শিরোধার্য্য করত মৃদুমধুর বিনয়বাক্যে কহিলেন, "নরনাথ! প্রতিদিন অর্থ গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই; কেননা উহা আমার হস্তে আসিবামাত্র ব্যয়িত হইয়া যাইবার সম্ভব; সুতরাং উহার দ্বারা আমার কোন ফললাভই হইবে না। সেই জন্য নিবেদন করিতেছি, পুস্তক পরিসমাপ্তির পর সমুদয় পারিশ্রমিক আমি একেবারে গ্রহণ করিব এবং তদ্দ্বারা বাদশাহের প্রসাদে দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ জন্মভূমি তুস্ নগরের পয়ঃপ্রবেশ-পথ বদ্ধ করিয়া হৃদয়ের চির-সঙ্কল্পিত ব্রত কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইব। রাজন! এই আমার আশা, এই আমার বাসনা। এক্ষণে

বাদশাহের যাহা অভিরুচি, তাহাই স্থিরতর হউক।" নরপতি মহাকবির সদুদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এই যুক্তিসঙ্গত প্রার্থনায় হাস্যমুখে সম্মতি প্রদান করিলেন।

ফেরদৌসী এইরূপে বাদশাহের প্রিয়পাত্ররূপে গৃহীত হইলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে, মধুর-বিনীত বাক্যালাপে, ও সৌজন্যে রাজসভাসদ হইতে সাধারণ জনগণের কেহই তাঁহার বশীভূত হইতে বাকি রহিল না। তিনি বৃদ্ধের স্নেহ, যুবকের সম্মান, সমবয়স্কের বন্ধুত্ব ও বালক-হৃদয়ের সরল প্রেম প্রাপ্ত হইলেন। সকলেরই সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য জন্মিল; সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ পরশ্রীকাতর খল, নীচমনা দুষ্টবুদ্ধি ক্রূর পরোন্নতি দর্শনে কখনই সুখানুভব করে না; তাহার যেন মর্ম্মদাহ উপস্থিত হয়; তাহার মনে হিংসাবৃত্তি কাল বিষধরের ন্যায় স্বতই উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং সে সেই অসৎ প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া পরকীয় অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অমাত্য-প্রধান হোসেন মইমন্দীন এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। ফেরদৌসী তাঁহার বিদ্বেষ-নয়নে পতিত হইলেন। তিনি

দারুণ অভিমান বশতঃ ফেরদৌসীর সহিত বাক্যালাপ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। তেজস্বী ফেরদৌসীও তোষা-মোদকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে একটী প্রবল শত্রু জানিলেও ভ্রমেও তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতেন না, অথবা হইলেও "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া নীরবতা অবলম্বন করিতেন। এইরূপ চতুরতাময় ব্যবহারে মন্ত্রীর মনে বিজাতীয় বিদ্বেষ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। হায় সময়ে যে ইহা কি ভীষণ হলাহলময় ফল প্রসব করিবে, কি ঘোর সর্ব্বনাশের প্রসূতী স্বরূপ হইবে, তাহা ভবিষ্যৎ অন্ধীভূত ফেরদৌসী একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না। তিনি রাজপ্রাসাদে আপন নির্দ্দিষ্ট গৃহে থাকিয়া ভাগ্যলিপির নিয়ন্তা অদ্বিতীয় বিচারকর্ত্তা জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করত প্রশান্তচিত্তে স্বীয় কার্য্য সাধনে নিরত হইলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### শাহ্‌নামা প্রণয়ন ও অঙ্গীকৃত অর্থ প্রাপ্তির ব্যাঘাত।

রাজাদেশে এক নির্জ্জন গৃহ কবির বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহ সুসজ্জিত—যে সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রয়োজন, তৎসমুদয় যথাস্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে গেলে, অভাবের অস্তিত্ব সেই গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। এহেন বিমল অনিল-হিল্লোলিত রমণীয় ভবনে সুকোমল আসনোপরি মহাকবি আসীন,—ধীর, শান্তমূর্ত্তি,একাগ্রচিত্তে পরমারাধ্যা কবিতাদেবীর সেবা করিতেছেন। প্রিয় পাঠক! ঐ দেখুন, তাঁহার রত্ন-প্রসবিনী সুধাময়ী লেখনীর বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, নিয়ত লক্ষ্য স্থানাভিমুখে অনন্যমনে অক্লান্ত অন্তরে প্রধাবিত হইতেছে। এবংপ্রকারে দেখিতে দেখিতে ত্রিংশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এই সুদীর্ঘ সময় অমরাবতী সদৃশী মহানগরী গজনী রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়া, মহাত্মা ফেরদৌসী অক্লান্ত অগাধ পরিশ্রমে এবং অপার অধ্যাবসায় ও যত্নে ষষ্টি সহস্র শ্লোকপূর্ণ ভুবনবিখ্যাত ঐতিহাসিক মহাকাব্য

শাহ্‌নামা রচনা সাঙ্গ করিলেন। এতদিনে গ্রন্থ প্রস্তুত হইল, এত দিনের পরে কবির কঠোর পরিশ্রমের অবসান হইল, তিনি চিন্তা-বারিধির অপার জলরাশি অতিক্রম করিয়া তীর-ভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। এপর্য্যন্ত যে সাধন-সহিষ্ণু মহাপুরুষ মুহূর্ত্ত কালও বৃথা অতিবাহিত করেন নাই, যামিনীর অধিকাংশ সময় জাগিয়াও যিনি কার্য্যক্ষেত্রের সীমা দেখিতে পান নাই, এক্ষণে মঙ্গলময়ের অনুগ্রহে তিনি নিশ্চিন্ত মনে শান্তি-সুখে যদৃচ্ছা বিচরণ করিবার যথেষ্ট অবসর পাইলেন।

অনন্তর যথাসময়ে বিদ্বজ্জনশরণ অমিতপ্রতাপ সম্রাট মাহ্‌মুদ শাহের সমীপে শাহ্‌নামা অতি যত্নে উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইল। সুলতান শাহ্‌নামার নাম শ্রবণ-মাত্র সমধিক ব্যগ্রতা ও উৎসাহ সহকারে উহা গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া গ্রন্থের লালিত্য ও গভীর ভাব-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া অনুপম স্বর্গ-সুধাস্বাদনে তৃপ্তিলাভ পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে অমর কবির ভূয়সী যশোব্যাখ্যা করিলেন। তিনি একে একে সভাস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীকে সেই রত্নখনি সম মহামূল্য মহাকাব্য প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে স্থানে পাঠ করিলেন, তিনি সেই স্থানেই মুগ্ধ হইয়া কেহ "ইহার

পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সুধাবৃষ্টি হইয়াছে," কেহ "কাব্যের সর্ব্বাঙ্গে মুক্তা গ্রথিত হইয়াছে" ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া একবাক্যে রচয়িতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এই আনন্দ-কোলাহলে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। অতঃপর বিচক্ষণ গজনীপতি অমাত্য-শ্রেষ্ঠ হোসেন মইমন্দিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "জগৎ গুণের পক্ষপাতী। গুণবানের সম্মান বৃদ্ধি ও মর্য্যাদা রক্ষা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যিনি গুণীর গুণের আদর করিতে জানেন না, তিনি মনুষ্য নামের যোগ্য নহেন। তিনি পণ্ডিত হইলেও মূর্খ; ধনী হইলেও নির্ধন এবং প্রবীণ হইলেও অপ্রবীণ বালক, ইহা জগৎ বলিতে বাধ্য। অতএব মন্ত্রিন! আমার অঙ্গীকৃত দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা), যাহা কাব্যের শ্লোক সংখ্যানুসারে গণনায় ষষ্টি সহস্র নির্ণীত হইতেছে, (১) এবং তৎসহ পুরস্কার স্বরূপ হস্তীখেলাতাদি সর্ব্বাগ্রে ফেরদৌসীর নিকট প্রেরণ কর।" সুলতানের এই আদেশ শ্রবণে মন্ত্রী হোসেন মইমন্দীনের মনে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি পরম শত্রু ফেরদৌসীর সৌভাগ্য দর্শনে মর্ম্মবেদনায় কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহি-

(১) ৬০ সহস্র দিনার বর্ত্তমানের প্রায় ৭॥০ লক্ষ টাকার সমান।

লেন। কিসে তাহার অনিষ্ট হইবে, কি করিলে তাহার আশা-তরু উন্মূলিত হইতে পারে, চিন্তাকুল চিত্তে সেই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এ সংসারে মন্দ বুদ্ধি শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু সৎকার্য্যের সূত্র শত যত্নেও খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। পরের অনিষ্ট অনায়াসেই করা যাইতে পারে, কিন্তু উপকার করা সহজ ব্যাপার নহে। এই যে কারু-কার্য্য বিচিত্রিত সুন্দর অট্টালিকা নভস্পথে মস্তকোন্নত করিয়া সুষমা বিস্তার করিতেছে, ইহা এই মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভূমিসাৎ করা যাইতে পারে, কিন্তু গঠন করিতে কত যত্ন, কত শ্রম, কত সময় লাগিয়াছে, একবার তাহা প্রণিধান করিয়া বুঝ দেখি? যদি বুঝিতে, জগৎ যদি তাহা বুঝিত, তবে পরহিংসা, পরদ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তিগুলি মনুষ্য সমাজে কথনই প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না—এই সংসার সুখের শান্তি-নিকেতন হইত। কিন্তু জগতের বুঝিবার সে শক্তি কোথায়? জগৎ সেরূপ সুখময় স্বর্গরাজ্য হইবে কেমন করিয়া? সর্ব্ব বিঘ্ন-সঞ্চারিণী মোহময়ী মায়া স্বীয় অক্ষুণ্ণ প্রতাপ বিস্তার করিয়া মানবকে ক্রীড়া-পুত্তলির ন্যায় অসৎ কার্য্যের দিকে যে প্রতিনিয়তই পরিচালিত করিতেছে! মানব

তাহাতেই মগ্ন! সে প্রভাব, সে প্রলোচনা পরিহার করিতে পারে, এই বিশ্বভূমণ্ডলে এরূপ ক্ষমবান বীর-পুরুষ অতি বিরল। আমাদের প্রধান মন্ত্রীও আজ সেই কুহকিনী মায়ার সর্ব্বতোমুখী প্রভাবের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তাহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন; তাই তিনি সহজেই অনিষ্টের কৌশলময় উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়া গজনীশ্বর সুলতান মাহ্‌মুদকে বিনয়-নম্রভাবে কহিলেন "সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য; কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আশা করি, অনধিকার চর্চ্চা হইলে অনুগৃহীত দাসকে কৃপাবলোকনে সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। দেখুন, ফেরদৌসী এক জন হীনাবস্থাপন্ন অতি সামান্য ব্যক্তি; স্বর্ণ মুদ্রা কখন চক্ষে দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। এমত স্থলে যদি এই প্রচুর অর্থ ও বাদশাহ-প্রদত্ত মূল্যবান পুরস্কার পরিচ্ছদাদি তাঁহাকে এককালে প্রদান করা হয়, তবে ইহ জীবনে তৎসমুদয় ভোগ করা দূরে থাক, দর্শনমাত্র আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে অকালে শমন পথের পথিক হইতে হইবে। কেননা সুখাবসানে সহসা অতি দুঃখ অথবা দুঃখাবসানে অতি সুখ উপস্থিত হইলে মানবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে।

এই জন্যই বলিতেছি, আপনার অঙ্গীকার পালন করিতে যাইয়া এক জনের মৃত্যুর কারণ হইয়া চিরদিনের জন্য দুরপনেয় দুর্ণাম ক্রয় করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। তবে জাঁহাপানার যাহা অভিরুচি, তাহাই হইবে; আমার কর্ত্তব্য চরণোপান্তে নিবেদন করিলাম মাত্র।”

প্রধান মন্ত্রী হোসেন মইমন্দীন অতি বিচক্ষণ, সদ্বক্তা ও বাদশাহের অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি স্বীয় স্বাভাবিক মধুর বক্তৃতা শক্তি দ্বারা এই বিষয় এরূপ উদ্দীপনার সহিত অথচ সরলতা রক্ষা করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, বাদশাহ নীরবে তন্ময় হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক বাক্য অবশ্য গৃহীতব্য বলিয়া অবধারণ করিয়া লইলেন। হায় যে ভীম-বিক্রান্ত অদ্বিতীয় বীরপুরুষ স্বীয় অমিত তেজ ও তীক্ষ্ন বুদ্ধিবলে কত কত সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, করতলগত ও সুনিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন; কত রাজা, রাজপুত্র বা অন্যবিধ ব্যক্তির ভাগ্যচক্রের গতি দিগন্তরে বিঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছেন; আজ তিনি মন্ত্রীর এই কৌশল-জাল ছিন্ন করিতে পরাভব মানিলেন। কিন্তু তিনি চিন্তাকুল-চিত্তে আপন প্রতিজ্ঞা ও মন্ত্রীর মন্ত্রণা, এই উভয় বিষয় আলোচনা করিয়া মনে মনে বহু বাদানুবাদ করিলেন।

অবশেষে অনেক বিবেচনার পর মন্ত্রীর বাক্য সুযুক্তি-সঙ্গত ও যথার্থ জ্ঞান করিয়া কবিবরের নিকট সুবর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে ষষ্টি সহস্র রৌপ্য মুদ্রা পাঠাইতে অনুমতি করিলেন;—মন্ত্রীর পরিশ্রমের সাফল্য, বৈরিতা-সাধন-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত ও মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

এস্থলে আমরা সত্যের অনুরোধে সহৃদয় পাঠকবর্গের সমক্ষে একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে প্রধান মন্ত্রী হোসেন মইমন্দীনের চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আনুপূর্ব্বিক বিবেচনা করিতে গেলে ঐ বর্ণনা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, উহাতে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। কেননা যে ব্যক্তি ভুবনবিজয়ী মহাজ্ঞানী সুলতান মাহমুদের মন্ত্রীকুল-শিরোমণি ছিলেন, যাঁহার সুমন্ত্রণা প্রভাবে একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত হইত, যিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও সহৃদয় বলিয়া সর্ব্বসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সেই উন্নতচেতা মহামতি মইমন্দীনের চরিত্রগত দোষ যে এতদূর নীচতাব্যঞ্জক, ঘৃণার্হ ও নিন্দনীয় ছিল, তাহা কোনক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, মন যেন সে কথায় সম্মতি দিতে

চাহে না। বিশেষতঃ গ্রন্থান্তর পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কবির সহিত মন্ত্রী মইমন্দীনের কস্মিনকালে কোনও প্রকার অসদ্ভাব ঘটে নাই, তিনি ফেরদৌসীর এই মহদনিষ্টের অনুষ্ঠাতা বা অধিনায়ক ছিলেন না, ইহা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে যে তিনি নির্লিপ্ত ও নির্দ্দোষ ছিলেন, ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। অপরন্তু ইহাতে যে তাঁহার কিঞ্চিৎ ত্রুটি ঘটিয়াছিল, তাহা হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই অবলীলাক্রমে বলিতে বাধ্য। কেননা এতাদৃশ একটী গুরুতর কার্য্যের অবতারণা মন্ত্রীর অজ্ঞাতসারে কিছু সংঘটিত হয় নাই। মহাকবির সেই গ্রহবৈগুণ্যের প্রস্তাবক যে অপর এক ব্যক্তি ছিল, তাহা তিনি অবশ্যই অবগত ছিলেন। তিনি উহা জানিতে পারিয়াও প্রতীকার চেষ্টা করেন নাই। যদি করিতেন, যদি ফেরদৌসীর পক্ষ সমর্থনার্থ একটীও কথা কহিতেন, তবে আজ আমরা কবি-ভাগ্যের বিষম বিড়ম্বনা ও বাদশাহের অপযশ-কাহিনী শুনিতে পাইতাম না, তবে আজ শাহনামা-শিরে সম্রাট মাহমুদের অপবাদ-গাথা গ্রথিত দেখিতাম না। সুতরাং ইহা তাঁহার ত্রুটি বা ভয়ানক ভ্রম নহে ত কি বলিব? যাহা হউক, উল্লিখিত গ্রন্থে

কবির সেই বিরুদ্ধবাদীর সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত আছে, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে তাহা প্রকটিত করিলাম।

এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কবিবর ফেরদৌসী গজনী নগরীতে জীবনের এই নূতন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরিণামদর্শিতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন নাই। তিনি রাজাজ্ঞানুসারে যে সভাসদের নিকট হইতে আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত প্রাপ্ত হইতেন, সেই ব্যক্তির মানসরঞ্জন ও সম্মান প্রদর্শনার্থ তৎসম্বন্ধে কতিপয় প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করেন। কিন্তু আয়াজ নামে এক ব্যক্তি বাদশাহের প্রধান প্রিয়পাত্র ছিলেন; আয়াজ ফেরদৌসীর অনেক উপকার করিয়াছিলেন। তিনি সেই আয়াজের বিষয়ে কিছুই করেন নাই। এই নিমিত্ত আয়াজ অতিশয় কোপান্বিত হন এবং মানব-স্বভাবসুলভ বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ফেরদৌসীর অনিষ্ট ও রাজকীয় স্বার্থ ব্যর্থ কামনায় গোপনে ছিদ্রান্বেষণ করিতে থাকেন। সহজে সুযোগও ঘটিয়া গেল। তিনি ফেরদৌসীর কতিপয় কবিতা হইতে এমত বহুসংখ্যক শ্লোক নির্ব্বাচন করিয়া বাহির করিয়া লইলেন, যাহা ব্যাখ্যা করিয়া বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ও সত্য বিশ্বাসের অন্তরায়

বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন। আয়াজের ব্যাখ্যা পরম্পরায় ফেরদৌসী ধর্ম্মমতবিরোধী ও কল্পনার উপাসকরূপে প্রতিপন্ন হইলেন। সুলতান মাহমুদ, কবিকে তাদৃশ ঘৃণিত ও অপবিত্র মতের পোষক জানিতে পারিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন; কবির প্রতি তাঁহার যে ভক্তি, প্রীতি ও অনুরাগ ছিল, তাহা এক্ষণে শিথিলীকৃত হইল। তখন মহাকবি বাদশাহের বিরক্তি, সভাসদ জনের ঈর্ষা ও অপর কোন কোন ব্যক্তির মনোভাব জানিতে পারিয়া আপনাকে মহাবিপদাপন্ন জ্ঞানে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। কি করিবেন? কিরূপে বাদশাহের ক্রোধের শান্তি করিবেন? কিরূপে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিবেন? কি কৌশলেই বা জীবন রক্ষা হইবে! এই দুর্ভাবনায় তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত হইল। সুতরাং তখন কোনই উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। অবশেষে একদা সুযোগানুসারে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আপনার ধ্বংসকারী মিথ্যাপবাদ ক্ষালনার্থ বাদশাহের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া করুণকাতরে অথচ দৃঢ়তার সহিত তদ্বিষয় অস্বীকার করিয়া প্রতিবাদ করিলেন। আয়াজ যে সমস্ত কবিতার ভাবার্থ ব্যক্ত করিয়া কবির ধর্ম্মমতের

পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ফেরদৌসী তৎসমুদয় আপন অনুকূল মতের পরিপোষক; সত্য বিশ্বাসের বিপরীত নহে, ইহা বিশদরূপে সুলতানের গোচর করিলেন। বাদশাহ তাহাতে সংপূর্ণ সন্তুষ্ট না হইলেও কবিকে অভয় দান করিলেন এবং অন্যমনস্কভাবে এই মাত্র বলিলেন যে "তুস্ নগরনিবাসী যাবতীয় লোক এই একই চরিত্রবিশিষ্ট; ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা সকলেই সমান।"

যাহা হউক, কবি রক্ষা পাইলেন। সুলতান তাঁহাকে অভয়দান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সন্দেহ তিরোহিত হইল না। অমঙ্গলের ভীষণ বিভীষিকা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল। কি করিবেন? রাজার অসন্তুষ্টিতে বিষম বিপন্ন হইয়াও তিনি অপার্থ্যমানে ও স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধার জন্য গজনীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেইরূপ ভয়ানক আশঙ্কা এবং দুশ্চিন্তার গভীর গহ্বরে নিপতিত হইয়াও তাঁহার অমৃত-নিস্যন্দিনী লেখনী ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম লাভ করে নাই। হৃদয়ে চিন্তা, মনে ভয়, নয়ন সতর্ক প্রহরীর ন্যায় চতুর্দ্দিকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে নিরত; আর লেখনী অবিরাম গতিতে চলিতেছে। কিন্তু সুখের বিষয়, এই উৎকণ্ঠা-অশান্তির

মধ্যেও তিনি আশার সূত্রবৎ সূক্ষ্ম রেখা দেখিতে পাইয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কারণ এই সময়ে সাধারণ জনগণ কবির কাব্য-ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মানের উচ্চাসন প্রদান করেন। সকলে এতই প্রীত হইল যে, প্রতিদিন চতুর্দ্দিক হইতে বিবিধ উপাদেয় উপহার আসিয়া তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। কে পাঠাইল এবং কেন পাঠাইল? তাহা তিনি জানিতে চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা সাধারণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং সেই আনন্দ ও উৎসাহ বলে বলীয়ান হইয়াই কবি ধীরতার সহিত শান্তচিত্তে শাহনামা রচনা পরিসমাপ্তি করিতে মনোনিবেশন করিলেন।

অনন্তর মহাকবি ফেরদৌসী ত্রিংশৎ বর্ষব্যাপী অবিরাম পরিশ্রমের পর শাহনামা সাঙ্গ করিলেন। যথাসময়ে সেই মহাকাব্য গজনীশ্বরের দরবারে প্রেরিত হইল। গজনীরাজ সুলতান মাহ্মুদ সেই দেবতা-সুলভ অগাধ জ্ঞানের নভস্পর্শী সমুজ্জ্বল স্তম্ভ স্বরূপ মহাকাব্য দৃষ্টে যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার আশ্রয়ে "তাঁহারই সাহায্যে ঈদৃশ একটী চিরস্মরণীয় মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, এই গৌরবে আপনাকে

গৌরবান্বিত জ্ঞান করিয়া স্ফীতবক্ষে আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে কবিকে প্রতিশ্রুত মুদ্রা দিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু তা হইলে কি হইবে? ক্রূরমতি আয়াজের এ পর্য্যন্ত ক্রোধশান্তি হয় নাই। তাঁহার প্রথম কৌশল নিষ্ফল হওয়ায় তিনি অধিকতর কুপিত ও উত্তেজিত হইয়াছিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সময়ে ফেরদৌসীর অপকার্য্যের প্রতিশোধ লইবেনই লইবেন। এক্ষণে শত্রুতা সাধনের—প্রতিহিংসা চরিতার্থতার শুভ সুযোগ উপস্থিত; সুতরাং আয়াজ কি আর স্থির থাকিতে পারেন? শিকার সম্মুখীন হইলে শিকারী কখনই অন্য-মনস্ক থাকে না, আপন আয়ুধ গুলি গুছাইয়া লইয়া নিক্ষেপের উপায় দেখে। আয়াজ তাই আজ শত্রুহননার্থ প্রস্তুত হইয়া রাজ সকাশে উপনীত হইলেন এবং বাক্য-জাল বিস্তার করিয়া বিবিধ প্রকারে বাদশাহকে বুঝাইতে লাগিলেন। বাদশাহ প্রিয়তম পারিষদ আয়াজের কথা যথার্থ বলিয়া অবধারণ করিলেন। আয়াজের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল, তাঁহার হৃদয়ের গুরু ভারের যেন লাঘব হইল। বাদশাহ আয়াজের কর্তৃত্বাধীনে ষষ্টি সহস্র রৌপ্য মুদ্রা (দরহাম) ফেরদৌসীর সমীপে প্রেরণ করিতে অনুমতি করিলেন।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### সুলতানের ক্রোধ ও ফেরদৌসীর পলায়ন।

আয়াজের মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। আজ তাঁহার আনন্দের সীমা নাই; মনে মনে আত্মক্ষমতার প্রশংসা করিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতেছেন এবং সমচরিত্রের ব্যক্তির নিকট স্পর্দ্ধার সহিত আস্ফালন করিতেছেন কিন্তু তখনও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, যাহা কেবল বাক্যে হইয়াছে, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে ফিরিতেছেন। কখন্ রজনী প্রভাত হইবে, কখন্ ফেরদৌসীর ত্রিংশ বর্ষের শ্রম-জল-বর্দ্ধিত আশা-লতার মূলে কুঠারাঘাত করিবেন, এই দুর্ভাবনায় আয়া-জের আর নিদ্রা আসিল না; তিনি নিশীথ সময়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাসাদের ছাদোপরি সুশীতল মারুত-হিল্লোলে কখন উপবেশন করিতেছেন, কখনও বা মৃদুমন্দ পদচারণা করিয়া ফিরিতেছেন, আর দুর্ম্মনায়-মানভাবে প্রকৃতির প্রমোদকর বিচিত্র শোভা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। দেখিতেছেন, অপার আকাশ-বারিধি-বক্ষে অশান্ত নীরদ-লহরীমালা ওতপ্রোতভাবে ছুটাছুটি করিতেছে; কেহবা দলভ্রষ্ট হইয়া বেগে ছুটিয়া গিয়া

অলক্ষ্যে কোথায় মিশাইয়া যাইতেছে। নক্ষত্রকুল সেই উচ্ছৃঙ্খল মেঘমালার অত্যাচারে কখন নিমজ্জিত, কখন ভাসমান হইতেছে। তাহাদের কনক-কান্তির কমনীয় প্রভা অপূর্ব্ব মাধুরী ঢালিতেছে। কিন্তু এই সমস্ত মনোরম দৃশ্য আয়াজের অন্তরে কিছুমাত্র অঙ্কিত হইতেছে না। তিনি যে মহাধ্যানে মগ্ন, তাহাতেই ব্যস্ত আছেন; সে ধ্যানমুগ্ধ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, বাহ্য দৃশ্যে আকৃষ্ট হইতেছে না—আপন লক্ষ্য বস্তুর অপেক্ষায় চাহিয়া রহিয়াছে। এ দিকে পূর্ব্ব নভঃ ক্রমেই পরিষ্কৃত; আলোকের সূক্ষ্ম রেখা শনৈঃ পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে নলিনীনায়ক দিনকর উদয়গিরি অতিক্রম করিয়া নেত্র-পথে সমুপস্থিত। কি রমণীয় দৃশ্য! কি চিত্ত-চমৎকারী চিত্র!! জগৎ যেন নব সাজে সজ্জিত হইয়া আনন্দে হাসিতে লাগিল। এই সময়ে আয়াজেরও সমাধি ভঙ্গ হইল, তিনি সেই হাসি রাশির সহিত আপন হাসি মিশাইয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন।

আয়াজ সর্ব্বাগ্রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান করিয়া রাখিয়া কোষাগারে গমন করিলেন এবং রাজাজ্ঞানুসারে কোষাধ্যক্ষের নিকট ষষ্টি সহস্র রৌপ্য মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক থলিয়াবদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত থলিয়া হস্তী-

পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া ফেরদৌসীর সমীপে প্রেরিত হইলে আয়াজ হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। এই সময়ে ফেরদৌসী সাধারণ স্নানাগারে স্নান করিতেছিলেন। তিনি সংবাদ পাইলেন যে, বাদশাহের প্রেরিত মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া-পৃষ্ঠে হস্তী সহ রাজানুচর তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। এই সুসমাচার শ্রবণে ফেরদৌসী আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলেন; হর্ষে তাঁহার আপাদ মস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া গেল; তাঁহার অন্তরে কি যে এক সুখের তুফান বহিতে লাগিল, তাহা লেখনী সাহায্যে প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। তিনি তখনি মঙ্গলময় বিশ্বপতিকে ধন্যবাদ ও মাহমুদ শাহের কল্যাণ কামনা করিলেন এবং সত্বর স্নানকার্য্য সমাপনান্তে বহির্গত হইলেন। অমনি বাদশাহ প্রেরিত মুদ্রাথলি সমূহ তাঁহাকে প্রদত্ত হইল, তিনিও হর্ষবিস্ফারিত লোচনে অগ্রসর হইয়া বাদশাহের জয়োচ্চারণ করিয়া তৎসমুদয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হরিষে বিষাদ! আশায় প্রতারণ!! সকলই আকাশ-কুসুমবৎ অনর্থক হইল। ফেরদৌসী সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ভাবিয়াছিলেন, সুলতান অবশ্য অঙ্গীকৃত সুবর্ণ মুদ্রাই পাঠাইয়া দিয়াছেন। পরন্তু সে অটল বিশ্বাস এক্ষণে অন্তর্হিত হইল৺ থলিয়া সমূহের মুখবন্ধন উন্মো-

চিত হইলে তন্মধ্যে রৌপ্য মুদ্রা দর্শনে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ভীষণ কালানল সহযোগে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; বদন বিকৃত-ভাবে ফিরাইয়া লইলেন এবং মাহমুদ শাহের অকথ্য অন্যায়াচরণে মহাক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইলেন। ফলতঃ এই অবজ্ঞাজনক কার্য্য তাঁহার পক্ষে অসহ্য অবমাননা বলিয়া প্রতীত হইল। তিনি এতদূর ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, পূর্ব্বাপর কিছুমাত্র বিবেচনা করিয়া না দেখিয়া সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানেই ঐ মুদ্রা রাশি তুচ্ছজ্ঞান করত উহার বিংশতি সহস্র স্নানাগারের রক্ষককে এবং বিংশতি সহস্র জনৈক মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে দান করিয়া দিলেন। অবশিষ্ট যে বিংশতি সহস্র রহিল, তাহা রাজকীয় মুদ্রা-তত্ত্বাবধায়ক ভৃত্যকে প্রদান করিয়া দুঃখ-কম্পিত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সুলতানকে জ্ঞাপন করিও যে ফেরদৌসী এই রৌপ্য রাশির পুরস্কার প্রত্যা-শায় ত্রিংশ বর্ষব্যাপী অসহনীয় পরিশ্রমের কার্য্য করে নাই।

ফেরদৌসীর অর্থ বিতরণের সংবাদ অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। সকল সমাজেই আন্দোলন চলিতে লাগিল। তরলমতি লোকেরা কার্য্যের আহংপর্য্য হৃদয়-

ঙ্গম না করিয়া "যাহারা পাইয়াছে, তাহারাই ভাগ্যবান” বলিয়া কতই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; কাহার বা আক্ষেপে হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কোন জ্ঞানী মহোদয় কবির অসৌজন্য ও অভদ্রতা প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতার উৎস খুলিয়া দিলেন। কোন ব্যক্তি বা রাজ্যাধিপতির প্রতিজ্ঞা-পালনাক্ষমতার উল্লেখে অতি সন্তর্পণে ও মৃদুস্বরে স্বপক্ষের মধ্যে সাহসের পরিচয় দিতে ক্ষান্ত হইল না। এইরূপে নানা মুনির নানা মতের অবতারণা হইল; নগর-ময় এই কথারই রটনা। সুলতান মাহমুদও যথাসময়ে এই ঘটনা কর্ণগোচর করিলেন; শ্রবণমাত্র তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, কার্য্যটী ন্যায় ও ধর্ম্ম বিগর্হিত হইয়াছে, কবির প্রতি তিনি নিতান্তই অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। অনুতাপে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল, তৎসহ ক্রোধেরও উদ্রেক হইল। তিনি যে প্রিয় পারিষদের প্ররোচনায় এই কলঙ্কের কার্য্য করিয়াছেন, প্রথমতঃ সেই আয়াজের উপর অতীব অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না; কেবল রোষ-কষায়িত লোহিত লোচনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চতুর ধূর্ত্ত আয়াজ বাদশাহের সেই বাহ্য ভাব-ভঙ্গি ও নিস্তব্ধ-ভ

দেখিয়া বুঝিলেন, সম্রাটের মনে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং সময়োচিত ব্যবহারে তাহাতে শান্তি-বর্ষণ করা কর্ত্তব্য। এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া আয়াজ বাদশাহের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে নিরত হইলেন; তিনি স্বীয় স্বাভাবিক বাঙ্‌মাধুর্য্যে ও চাতুর্য্য-কৌশলে আত্মদোষ ক্ষালনার্থ বিশদভাবে বুঝাইয়া কবির মস্তকে যাবতীয় অপরাধ এরূপে প্রত্যর্পণ করিলেন যে ফেরদৌসী সহজেই রাজার প্রতি অসম্মান ও অবমাননা প্রদর্শন অপরাধে দোষী প্রমাণিত হইলেন।

আয়াজের বাক্যে সুলতানের মনের গতি অন্য দিকে ফিরিল। তিনি নিজে যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহাকে চিরদিন সভ্য সমাজে নিন্দিত হইতে হইবে, সেই অপকর্ম্মের প্রস্তাবক ক্রূরমতি আয়াজের আর কিছুমাত্র ত্রুটি দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু নিরীহ ফেরদৌসীকেই যত দোষের মূল বলিয়া অবধারণ করিলেন। ফেরদৌসীর ঔদ্ধত্য, অসৌজন্য ও অবজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া গজনী-পতি বিজাতীয় ক্রোধে স্ফীত ও অধীর হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, ভেক হইয়া ভুজঙ্গে তুচ্ছজ্ঞান। ক্ষুদ্রপ্রাণ পতঙ্গ হইয়া মহাকায় মাতঙ্গের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান!! কি স্পর্দ্ধার কথা! কি গর্ব্বের

বিষয়!! এ অসহনীয় অপমান কি সহ্য করিতে পারা যায়? দোষীর দণ্ডবিধান করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। রোষো-ন্মত্ত মাহমুদ তাই প্রতিহিংসা প্রণোদিত হইয়া গভীর গর্জ্জনে এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, পরদিবস প্রাতঃ-কালে ফেরদৌসীকে হস্তীপদতলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। এই ভীষণ সংবাদ অচিরে নগরময় বিঘোষিত হইল। দীন ধনবান, জ্ঞানী অজ্ঞান, বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রবীণ, যে শুনিল, সেই স্তম্ভিত ও মহাদুঃখিত হইল। সকলেরই বদনমণ্ডল শুষ্ক হইয়া মলিন মূর্ত্তি ধারণ করিল। কবির বিপক্ষকুলও এ ঘটনায় অতীব চিন্তিত। সুলতান যে এরূপ কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিবেন, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও জানি-তেন না। এক জন নিরপরাধ লোক, বিশেষতঃ অগাধ ধী-শক্তিশালী পণ্ডিত ব্যক্তি অকারণে এরূপ মৃত্যু-নির্য্যা-তন ভোগ করিবে, ইহা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় বিবে-কের বিষম দংশনে তাঁহারা জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিলেন। কিন্তু করিবেন কি? উপায় নাই। তাঁহাদের কৃত-কার্য্যের উপর আর একটী কথা বলিতেও কাহারও সাহস হইল না। এ দিকে মন্দভাগ্য ফেরদৌসী জনৈক বন্ধুর প্রমুখাৎ সুলতানের সেই কঠোর দণ্ডাজ্ঞার কথা

শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিচলিত হইলেন; তাঁহার মস্তকে সহসা যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। হায় এবার আর পরিত্রাণ নাই; আসন্ন রাজ-কোপানলে অচিরে ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে হইবে, ইহাই ভাবিয়া তাঁহার অন্তর বিষাদ-সিন্ধুর অন্তস্তলে নিমজ্জিত হইল; চতুর্দ্দিকে কূল-কিনারা দেখিতে পাইলেন না; অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার অপাঙ্গে অশ্রুবিন্দুর সঞ্চার হইল। যে হৃদয় বিমল আনন্দে উজ্জীবিত হইয়া প্রফুল্ল পদ্ম সদৃশ ঢল ঢল করিত, যে মুখমণ্ডল স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিধৌত হইয়া বিশদ জ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়াছিল, আজ তাহা পরিশুষ্ক—ম্লান। আজ তাহা রাহু-স্পর্শে চন্দ্রের ন্যায় কম্পিত—শঙ্কিত; আজ তাহা কীট দংশনে কুসুমবৎ সঙ্কুচিত। ভাবনায় তাঁহার বিস্তৃত ললাটফলক কালিমাময় ও কুঞ্চিত হইয়া গেল। অহো এই ভীষণ বিপদ সময়ে ফেরদৌসী যে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন, তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কে বলিতে পারে? কিন্তু এ সংসারে বাস্তবিক জ্ঞানবান পুরুষেরা বিপদে নিতান্ত জ্ঞানশূন্য হন না। তাঁহারা অসহ্য বিপত্তি ভার মস্তকে ধারণ করিয়াও ধৈর্য্যশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা সুফলও

প্রাপ্ত হন। মহাকবি ধীরতার সহিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সাহায্যে স্থির করিলেন যে, এবারও বাদশাহের করুণা ভিক্ষা ব্যতীত আর উপায় নাই। তিনি রাজরাজেশ্বর, বিচক্ষণ ও বিদ্যালোক-সম্পন্ন-হৃদয়; বিশেষতঃ সুবিচারে এই বিশ্বভূমণ্ডলে তাঁহার প্রভূত সুখ্যাতি আছে। আমি অভ্যাগত, তাঁহার আশ্রিত; তাঁহারই অনুমতিক্রমে তাঁহারই কার্য্যে নিয়োজিত। আমার প্রতি তিনি অবিচার করিবেন কি? কখনই না। যদি কোন ত্রুটিই ঘটিয়া থাকে, যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কোনরূপ অন্যায়ই করিয়া থাকি, তবে বিনয়ে কহিব, তিনি অবশ্যই মার্জ্জনা করিবেন। বিনয়ে কি না হইয়া থাকে? বিনয়ের অধীন কে নহে? যখন অজ্ঞানান্ধ পশুপক্ষী ভুজঙ্গমাদিও এই বিনয়-মন্ত্র-মুগ্ধ, তখন জ্ঞান-রত্নমণ্ডিত মানব তাহাতে যে নম্র হইবে না, কে বলিল! আর যদি সে বীর হৃদয় নিতান্তই কাঠিন্য ভাব ধারণ করিয়া থাকে, তবে তাহা কোমল করিতে অধিক আয়াসের আবশ্যক করিবে না। তৃণস্তূপ অনল সহযোগে যেমন সহজেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তেমনি উহা অল্প বারিপাতে সহজেই নির্ব্বাণ লাভ করে। বীর হৃদয়েরও এই স্বভাব! সুতরাং চিন্তা কিসের? কবি

এইরূপ আলোচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ ত্বরিতপদে রাজ-প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলেন এবং প্রথমতঃ সসম্মান অভিবাদন পূর্ব্বক নতশিরে সম্রাটের চরণ চুম্বন করিলেন। পরে সুললিত ভাষায় বাদশাহের বদান্যতা ও রাজত্বের গৌরব বিষয়ে প্রশংসাকীর্ত্তন পূর্ব্বক করুণ-কাতরে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। তিনি এমনি সঙ্গত-যুক্তি দেখাইয়া আত্মদোষ খণ্ডন করিলেন যে, গজনী-পতির ক্রোধস্ফীত মন শান্তিভারে অবনত না হইয়া থাকিতে পারিল না। কবির কাকুতিমিনতি দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি ফেরদৌসীর বাগ্মীতায় মুগ্ধ হইয়া এবং তদীয় অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার সম্মান রাখিয়া হৃষ্টচিত্তে পূর্ব্বাজ্ঞা পরিহার পুরঃসর অভয় দান করিলেন।

বাদশাহের অভয় বাণীতে আশ্বস্ত হইয়া ফেরদৌসী পুনরভিবাদন পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি আসন্ন বিপদে পরিত্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের গভীর বেদনার আর কিছুতেই উপশম হইল না। ভয়ে তাঁহার যে সুখ-শান্তি, উল্লাস-আরাম চলিয়া গিয়াছিল, তাহা আর তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ করিল না। ভাবিলেন, এই শত্রু-সঙ্কুল ভয়ঙ্কর স্থানে

আর অবস্থিতি করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আমি বিদেশী—একাকী; ভাইবন্ধু, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি আপন বলিতে আমার এখানে কেহই নাই। সুতরাং শত্রুকুল কখন্ কোন্ সূত্র ধরিয়া কোন্ প্রমাদে পাতিত করিবে, কে বলিতে পারে? তখন অকালে অরাতি-করে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই জন্য সময় থাকিতে আত্মরক্ষার্থ কোন নিরাপদ স্থানে গমন করাই কর্ত্তব্য। মহাকবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কোন প্রিয় বন্ধুর নিকট হইতে গোপনে কিছু পাথেয় স স্থান করিয়া লইলেন। পরে গজনীশ্বরের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষের নিকট হইতে কৌশলক্রমে শাহ্‌নামা ফেরত লইয়া আসিলেন এবং তন্মধ্যে সুলতান মাহ্‌মুদের বিরুদ্ধে একটী তীব্র তিরস্কার ও কুৎসাসূচক ব্যঙ্গোক্তি কবিতা গোপনে সমস্ত রজনী জাগিয়া লিখিয়া দিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন। আমরা আমাদের প্রিয় পাঠকগণের বিদিতার্থ সেই ব্যঙ্গ কবিতাটীর যথাযথ বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম——

হে রাজন্! বাহুবলে রাজ্য বহুতর
করিয়াছ জয়, তবে ডরনা কাহারে।

কিন্তু কেন অত্যাচারি! পার্থিব বিভব
নিত্য নহে, অতি তুচ্ছ অনিত্য অসার।
নিত্য সত্য বিশ্বপতি পরম পিতায়
ভয় রেখ মনে সদা, ক'রনা পীড়ন
মানব সন্তানে আহা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর।
স্বর্গ বাঞ্ছা থাকে যদি চিতে, অকাতরে
দাও আত্মবলি তাহে। দিওনা যাতনা
এমন কি পীপিড়ারে, বসুন্ধরা তলে
যদিও দুর্ব্বল সেহ, ক্ষুদ্রকায় অতি;
কিন্তু ধরে দেহে প্রাণ দত্ত বিধাতার,
জীবন সমান প্রিয় সবারি জগতে।
প্রকৃতি আমার দৃঢ় তেজোবীর্য্যপূর্ণ
জেনেও কি অত্যাচারি। হয়নি কম্পিত
হিয়া তব, শোণিতার্দ্র খড়্গ মম হেরে!
হও নাই সঙ্কুচিত? হয়নি চেতনা
মর্ম্মদাহী ব্যথা দিতে মম সম জনে?
কোন্ বশে রত হলে হেন হেয় কাজে?
উপার্জ্জিলে নিজে আহা নিজ অপমান!
ঘৃণি যার ক্ষমতারে, তার আজ্ঞাক্রমে
মৃত্যু-দণ্ড হবে মম হস্তী পদতলে!!

কিসের কারণে? হায় বল কোন্ দোষে?
ভেবেছিলে চিতে, হব সন্ত্রাসিত আমি
তব ডরে, তুচ্ছ গণি যারে মনোমাঝে।
আমি সে কেশরী ভীম শোণিত-পিপাসী,
গ্রাসি আমি অধার্ম্মিক পাষণ্ড দুর্জ্জনে।
চূর্ণি তব দেহ পারি নিক্ষেপিতে দূরে,
নীল নদ বহে যথা রত্নরাজি তার!!
ভয় তোরে? নাহি ডরি (বিশ্বপতি বিনা)
ক্ষুদ্র নরে আমি; নত করি এই শির
শুধু সেই শান্তিময় বিভুর সকাশে।
তাঁরি অনুগ্রহে মম কবিতা-প্রবাহ
প্রবাহিত, থাকি তাঁর দৃঢ় সুরক্ষণে
নাহি ডরি পৃথিবীর অরাতি নিকরে!
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-প্রার্থনার ডালি
উৎসর্গ করিয়া সেই বিভুর উদ্দেশে,
এইরূপে মহানন্দে গানের গৌরবে
জীবন যাপন আমি করিব অবাধে।
জ্ঞান চক্ষে স্থির চিত্তে ভেবে দেখ দেখি,
মৃত্যু পরে হবে আহা কোন্ গতি তব?
ছিন্ন করি শতধায় দেহ যদি মম,

অনু-পরমাণু রূপে দেহ উড়াইয়া
প্রবল বাত্যায়, তবু এ মর জগতে
ফেরদৌসী চির তরে রবে বিদ্যমান।
কেননা হে দীপ্ত মম বীর-গাথা হতে
যশঃ-আশা তব ঠাঁই নাহি করি আমি।
কিন্তু সমুজ্জ্বল চির রবে বিন্দু-বরে,
অগণিত ধন্যবাদ-পাত্র যিনি ভবে।
আর সে মহিমান্বিত মাহাত্ম্য-সাগর
প্রেরিত পুরুষশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহে, যিনি
প্রেম ভরে তরাবেন বিশ্বাসী নিকরে।
আত্ম সমর্পণ আহা যে না করে তাঁয়,
নিরাশে জীবন তার হবে তেয়াগিতে।
নিক্ষেপিবে মোরে মত্ত হস্তী-পদতলে
যতক্ষণ নাহি মরি! উঃ আমার মরণ।!
এই অবমাননায় হয়ে উত্তেজিত,
প্রমত্ত মাতঙ্গ সম বলী আজি আমি।
ভাগ্য-গতি ফিরাইব তব হে মামুদ।
মানবে না ডর যদি, কিন্তু কর ভয়,
বিশ্ব-বিধাতায় আহা সৃষ্টিকর্ত্তা তব।
যুদ্ধ-বিশারদ কত বীরেন্দ্র-কেশরী

কত রাজা, রাজপুত্র, ধার্ম্মিক সুজন,
সলিম, জাম্‌সেদ, মনুচেহের তেজস্বী (১)
গেছেন ত্রিদিব ধামে, বৃথা শক্তি আহা!
রক্ষিবারে পারে নাই সেই বীরকুলে।
সবাই গেছেন চলে, কিন্তু জাগরুক—
আছে চিত্ত-ক্ষেত্রে তাঁরা জগত-বাসীর।
মরিবে মরিবে আর যত রাজগণ,
কেহই রবেনা হেথা; হবে ধূলিগত—
অনিত্য অসার যত মানব-শরীর!
অহো তব পিতা যদি হইতেন রাজা,
রাজ-গুণান্বিতা মাতা আর, তবে আজি
কবি-ভাগ্য অন্যরূপে হত উজ্জ্বলিত,
সম্মান সম্পদ যার ন্যায্য পুরস্কার।
কিন্তু হে কেমনে দিবে সে মর্য্যাদা তুমি?
নহে তব পিতৃবংশ উচ্চ সম্মানিত।
জন্ম তব নীচকুলে, ইস্‌পাহানের

(১) ঐতিহাসিক মহাকাব্য শাহ্‌নামায় এই বীরবৃন্দের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মকার-বংশধর তুমি হে মাহ্মুদ। ( ১ )
ধর্ম্মের উদ্ভব অহো হয় কভু পাপে ?
অত্যাচারী রাজ-ঠাঁই দয়া কি সম্ভবে ?
বদলে কি জলে ধুলে মসীর বরণ ?
তমস্বিনী তমঃ দূর কে পারে করিতে ?
যে বিটপী করে দান ফল তিক্ততম,
চির তিক্ত পুঁতিলেও স্বর্গোদ্যানে তাহা।।
মন্দ চিত্ত পাপে রত, যদিই বদলে
ভীষণ ভীষণতর পাপে আরো ধায়।
পক্ষান্তরে ত্রিদিবের নিত্য বিকশিত

---

( ১ ) ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, সুলতান মাহ্মুদের পিতা সুলতান নাসিরদ্দীন সবক্তগীন, আলপ্তগীনের ক্রীতদাস ছিলেন। আলপ্তগীন সবক্তগীনের গুণে মুগ্ধ হইয়া বুখারা প্রদেশের জনৈক সওদাগরের নিকটে তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, সবক্তগীন পারস্যের সম্রাট্ এজদি-গোর্দ্দের বংশোদ্ভব ছিলেন, কালের গতিতে এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হন। কিন্তু ফেরদৌসী তাঁহাকে কর্ম্মকার-তনয় অবধারণে, মাহ্মুদকে "ইস্পাহানের নীচ কর্ম্মকার বংশধর" বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। ফলে ইহার কোন্‌টী সমীচীন, এক্ষেত্রে তাহার বিচার করিবার আমাদের আবশ্যক নাই।

পুষ্পোদ্যানে দুগ্ধ-নদী যত করে গতি,
মধুরে মধুর সুধা লভে আরো তথা ! !
তব সম অত্যাচারী যে রাজা পীড়নে
দীনে, চির অপযশ ঘোষে তার ভবে।
এবে তুমি লক্ষ্য কর লক্ষ্য ফেরদৌসীর,
রাজাবলী গ্রন্থ তাঁর জিনিয়া সকলে
চির বিরাজিবে ভবে; নীতি-গাথা তার
শুনে সবে হবে তৃপ্ত, জ্ঞানী আরো জ্ঞানী।
প্রাচীন বীরেন্দ্রকুল উচ্চ গানে মম,
সজীব থাকিবে শোভা-প্রভা বিস্তারিয়া।
গাইনি কি আমি তুস্, কায়ুস্, ফেরিদূঁ,
অদ্বিতীয় বীর ধীর রোস্তম-মহিমা ?
করিনি কি দেওবন্দ বীরত্ব-বর্ণন,
শত্রু নাশে শস্ত্র যার ছুটিত বিমানে ?
ত্রিংশ বৎসরের শ্রম এবে সমাহিত,
মহান অদ্ভুত কত সমর-কাহিনী
বর্ণিয়াছি কষ্টে কত পরিশ্রম সহ;
কিন্তু ইহা নর-চিত্ত রাখিবে সজীব,
চৈতন্য দানিবে আর উচ্চ অনুষ্ঠানে।
কুসুম-কোমলা ধীরা লজ্জাবতী নারী

পাঠে ইহা হবে ভীমা সমর-রঙ্গিণী!
রাজ-অঙ্গীকারে অহো প্রলুব্ধ হইয়া
ত্রিংশ বর্ষব্যাপী ক্লেশ সহিনু জীবনে,
কিন্তু এবে বৃদ্ধ কবি হায় কি আক্ষেপ,
প্রতিশ্রুত পুরস্কারে বঞ্চিত কুক্ষণে।

গজনীপতির গ্লানিসূচক এবং মন্ত্রীর অদূরদর্শিতা প্রকাশক আরও কতিপয় কবিতা পত্র মধ্যে বাদশাহের শিরোনামে প্রেরিত হইল। এতদ্ব্যতীত সুলতান পবিত্র মস্‌জিদের যে স্থানে উপবেশন করিয়া প্রতিদিন উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, ঠিক তাহার পুরোভাগে নিম্নোদ্ধৃত কবিতার মর্ম্মানুযায়ী একটী শ্লোক লিখিয়া রাখিলেন।

১

গজনীপতির সভা রত্নাকর সম,
অকূল অতলস্পর্শ কিন্তু অতিশয়,
আছে বটে রত্নরাজি তাহে অনুপম,
প্রভায় সিন্ধুরে শুধু করে প্রভাময়।

২

রত্ন লোভে যত্ন করে আমি অভাজন,
ফেলিলাম জাল, লাভ না হইল হায়,

কি দোষ সিন্ধুর তাহে? ভুঞ্জে নরগণ
ভাগ্য-লিপি বশে ফল নিয়ত ধরায়।

এই সমস্ত দুরূহ কার্য্য অতি সাবধানে ও সঙ্গোপনে নির্ব্বাহ করিয়া কবি শশব্যস্তে জীবন লইয়া পলায়নপর হইলেন।

## নবম পরিচ্ছেদ।

### কবির দেশপর্য্যটন, স্বদেশ গমন, পরলোক প্রাপ্তি ও সঙ্কল্প সিদ্ধি।

মহাকবি ফেরদৌসী গজনী হইতে সকলের অলক্ষ্য বহির্গত হইলেন এবং অতি সন্তর্পণে নগর সীমা উত্তীর্ণ হইয়া প্রান্তর-পথে প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন। কত কত গ্রাম, নগর, পর্ব্বত, প্রান্তর, অরণ্য, নদ্যাদি এবং কত বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া অনাহার অনিদ্রায় কত প্রাকৃতিক নির্য্যাতন ভোগ করিয়া পরিশেষে তিনি বহুকষ্টে মাজিন্দারাণে (১) আসিয়া উপনীত হন। কিন্তু সেই স্থানে কয়েক দিবস থাকিয়া মনঃপূত না হওয়ায় খলিফার রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ

(১) পারস্যের উত্তর সীমাস্থ আলবোর্জ্জ পর্ব্বত ও কাস্পিয়ান সাগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী জনপদ।

বোগদাদ নগরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। বোগদাদেশ্বর মহামান্য খলিফা, কবির পরিচয় পাইয়া সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সভক্তি প্রিয় সম্ভাষণে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। এখানে আসিয়া রাজানুগ্রহে ফেরদৌসীর তাবত উদ্বেগ-আশঙ্কা দূরীভূত হইল। তিনি বোগদাদ-রাজপ্রাসাদে নিরাপদে ও নিশ্চিন্ত থাকিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় বিশ্ববিনোদিনী কবিতা দেবীর সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে বোগদাদ-পতির গুণানুকীর্ত্তনসূচক সহস্র-পদী একটী কবিতা ও অপর এক খানি কাব্যগ্রন্থ তৎ-কর্ত্তৃক প্রণীত হয়। খলিফা তদ্দর্শনে আনন্দিত হইয়া কবিকে ৬০,০০০ দিনার এবং অসাধারণ গুণের পুরস্কার স্বরূপ রাজসম্মান প্রকাশক এক মূল্যবান পরিচ্ছদ প্রদানে আপ্যায়িত করেন।

এ দিকে গজনীপতি প্রত্যূষ সময়ের উপাসনা নির্ব্বাহার্থ মসজিদাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন, ভিত্তি-গাত্রে একটী শ্লোক লিখিত রহিয়াছে। তিনি নামাজ (উপাসনা) সমাধান্তে উৎসুক অন্তরে উহার নিকটে যাইয়া পাঠ করিলেন এবং মর্ম্মাবগত হইয়া যারপর নাই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার প্রফুল্ল মুখ-কমল সহসা বিশুষ্ক হইয়া

গেল। কি এক অননুভূত গুরু ভারে মন অবনত হইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন, ইহা ফেরদৌসীর কার্য্য এবং বুঝিয়াই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনয়নার্থ জনৈক পরিচারককে অনুমতি করিলেন। কিন্তু ফেরদৌসী কোথায়? সেই নিগ্রহভীত জ্ঞানী পুরুষ গজনী কি? গজনীপতির অধিকার মধ্যে কি আর আছেন! পরিচারক কবির বাসগৃহে এবং অন্যান্য স্থানে বিস্তর অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করত কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "মহীপতে! কবি আর রাজধানীতে নাই, অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি পলাতক হইয়াছেন। সম্রাটের আদেশে পাছে পুনঃ বিপদগ্রস্ত হন, এই আশঙ্কাই তাঁহার পলাইবার প্রধান কারণ।" পরিচারকমুখে এই সংবাদ শুনিয়া সুলতান আরও সন্তপ্ত হইলেন। যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশনে তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল। তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়া মন্ত্রীর সমক্ষে কবির জন্য নানা-আক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময়ে আবার ফেরদৌসীর পূর্ব্বোক্ত পত্র আসিয়া উপস্থিত। কি ভয়ানক ব্যাপার! জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। সুপ্ত শার্দ্দূলকে কে যেন অলক্ষ্য প্রহারে জাগরিত করিয়া দিল। সুল-

তান সেই আত্মনিন্দাপূর্ণ, সভাসদের নীচতাজ্ঞাপক ও মন্ত্রীর অদূরদর্শিতার কুৎসাসূচক পত্র পাঠ করিয়া অতীব উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিতে লাগিল, নয়ন যুগল অগ্নিবৎ হইল, কলেবর কম্পন-বেগে আসন টলিয়া গেল। কিন্তু করিবেন কি? হস্তস্থিত তীর শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, পুনঃ তাহা ফিরাইয়া আনিবার উপায় কোথায়? তাই জ্ঞানরত্নমণ্ডিত বীরবর গজনীপতি বিবেক বলে অনেকাংশে ধীরতা অবলম্বন করিলেন। সেই রোষ-কষায়িত বিস্ফারিত লোচনে মন্ত্রীকে প্রভূত তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তোমারই অদূরদর্শিতায়, তোমারই অবিবেচনা—অবহেলায় আমি এমন একজন মহাকবিকে হারাইলাম। তোমার অনভিজ্ঞতায় দোষে অথবা প্রতিহিংসা সাধক ষড়যন্ত্রের বশে সামান্য অর্থ বিনিময়ে ভুবনের দুর্নাম ক্রয় করিলাম, চিরদিনের জন্য প্রতিজ্ঞাপালনাক্ষম নামে—দত্তাপহারী নামে অভিহিত হইলাম। যতদিন এই গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিবে, যত দিন জগতে বিদ্যাচর্চ্চা থাকিবে, ইতিহাসের সম্মান, লোক-চরিত্রের আলোচনা থাকিবে, ততদিন জনসমাজে আমার এ অপবাদ-কাহিনী বিলুপ্ত হইবে না—এ কলঙ্ক দূর হইবার

নহে। লোকে কথায় কথায় উপমা-প্রসঙ্গে আমার এ নিন্দাবাদ ঘোষণা করিবে। আমার এ বিশাল সাম্রাজ্য, ভাণ্ডারপূর্ণ ধনরত্ন, হয়-হস্তী-সৈন্য-সামন্ত, প্রজাকুলের এ সুখ-সমৃদ্ধি, কে উল্লেখ করিবে? কে তখন এই সমুদয়ের আলোচনা করিবে? অথবা করিলেও, তাহা কোন ফলোপধায়ক হইবে না; এই একটী দোষে সমুদয় গুণরাশি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, দুগ্ধভাণ্ডে গোমূত্র পতনের ন্যায় দয়ামায়া, শীলতা-ভব্যতা, বিনয়-বদান্যতা, সৌজন্য-সহৃদয়তা প্রভৃতি আমার খ্যাতিপ্রতিপত্তি সমুদয়ই বৃথায় যাইবে। ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয়, মর্ম্মদাহী যাতনার কথা আর কি হইতে পারে? হায় হায় মনুষ্যও কি এমন কুকর্ম্ম করিতে পারে?" গজনীশ্বর এই প্রকারে অনেক অনুতাপ করিলেন। ক্রোধের পরিবর্ত্তে অনুশোচনার অঙ্কুশ-আঘাতে তিনি যৎপরোনাস্তি যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে অপলকনেত্রে শূন্যপানে চাহিয়া রহিলেন। সভাসদবর্গের ষড়যন্ত্র, মন্ত্রীর শঠতা, কবির কষ্ট এবং নিজের ভ্রমজনিত অন্যায়াচরণ ইত্যাদি বিষয় একে একে আন্দোলন করিয়া দেখিলেন। অবশেষে প্রতিশ্রুত অর্থদানে এই কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষালন করাই শ্রেয়স্কর,

এই স্থির করিয়া মন্ত্রী মইমন্দীনের প্রতি অনুমতি করিলেন, "যাও, ফেরদৌসী যেখানেই থাকুন, নিকটে বা দূরদেশে যে রাজ্যেই গমন করুন, ত্বরায় তাঁহার অনুসন্ধান কর। আমি তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছি, ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া অবিচার করিয়াছি, পক্ষপাতিত্বের একশেষ দেখাইয়াছি, অতএব কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার শত সহস্র ক্ষমাপ্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া প্রতিশ্রুত অর্থ প্রেরণে সেই পূজ্যপাদ প্রবীণ পুরুষের সন্তোষ সাধন কর।" (১)

---

(১) অনেক গ্রন্থকর্ত্তা এই ঘটনাংশটী বিভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কবির পলায়নের বহু দিবস পরে সুলতানের কোন একটী ভারতাক্রমণ সময়ে একদা প্রধান মন্ত্রীকে তাৎকালিক অবস্থানুযায়ী শাহনামার একটী কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিয়া মাহমুদের মনে ফেরদৌসীর কথা জাগরিত হয়। তখন তিনি কবির প্রতি যে অবিচার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ক্ষোভের সহিত তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে প্রধান মন্ত্রী বলেন, "কবি এক্ষণে অতিবৃদ্ধ, তুস্‌ নগরে কষ্টে কালযাপন করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া সুলতান তৎক্ষণাৎ কবির উপযুক্ত ও নিজের পদোচিত পুরস্কার পাঠাইতে অনুমতি করেন।

মন্ত্রী সুলতানের আদেশ নীরবে নতমস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি অপর কোন কঠোরাদেশ যে হয় নাই, তাহাতেই পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে জগদীশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর কাল বিলম্ব না করিয়া কবির অনুসন্ধান জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কোথায়ও তাঁহার অন্বেষণ হইল না, প্রেরিত ব্যক্তিগণ হতাশ মলিনমুখে একে একে ফিরিয়া আসিল। মন্ত্রী তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ভীত ও চিন্তিত হইলেন। এই অকৃতকার্য্যতা হেতু পাছে আবার সুলতান কুপিত হইয়া তাঁহার উপর কোন দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন, এই আশঙ্কায় তিনি দিন যামিনী ম্রিয়মাণ অবস্থায় কাটাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সৌভাগ্যক্রমে অবগত হইলেন, কবিশ্রেষ্ঠ ফেরদৌসী বোগদাদের সুপ্রসিদ্ধ খলিফার রাজসভার শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। এই সংবাদ মাহ্‌মুদের কর্ণগোচর হইলে, তিনি কবিকে গজনীতে প্রেরণার্থ মহামান্য খলিফাকে সানুনয় অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার অনুনয় বিনয়, যত্ন-আগ্রহ সমুদয়ই বিফল হইল, ফেরদৌসী খলিফার নিকট সুলতানের প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইয়া জন্মভূমি তুস্‌ নগরে প্রস্থান করিলেন।

ফেরদৌসী যখন আর কোনক্রমেই গজনী রাজসভায় আসিলেন না; গজনীপতির অভয় বাণীতে তাঁহার আর আস্থা জন্মিল না; তখন সুলতান মাহ্‌মুদ অনন্যগতি হইয়া আপন প্রতিজ্ঞা পালনে উদ্যত হইলেন। তিনি বিশ্বস্ত লোকের তত্ত্বাবধানে ষষ্টি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও কবির উপযুক্ত রাজসম্মানজ্ঞাপক একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ ফের-দৌসীর নিকটে তুস্ নগরে প্রেরণ করিলেন এবং তৎসহ অনবধানতা প্রযুক্ত স্বীয় কৃতকার্য্যের জন্য মার্জ্জনা চাহিয়া প্রেরিত মুদ্রাদি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। রাজানুচরগণ যথাকালে তুস নগরে উপ-নীত হইলেন। কিন্তু হায় তাঁহাদের মস্তকের ভার নামাইয়া দিবেন, কাহার নিকটে? ইহা বড়ই অনু-তাপের ও নিরতিশয় ক্ষোভের বিষয় যে, তৎসমুদয় গ্রহণ করা দূরে থাক, কবিকে একবার চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিতেও হয় নাই, তিনি ইতিপূর্ব্বেই পার্থিব দুঃখের লীলা সম্বরণ পূর্ব্বক অনন্ত সুখময় স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করতঃ স্বীয় ফেরদৌসী (১) নামের গৌরব রক্ষা করিয়া-

(১) ফেরদৌসী শব্দের অর্থ স্বর্গীয়। ১০২০ খৃষ্টাব্দে কবির মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল।

ছেন। (১) রাজকীয় কর্ম্মচারীরা নগর-প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করিতেই দেখিলেন, কবির মৃত দেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য সেই পথ দিয়াই বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। এতদবলোকনে তাঁহাদের যুগপৎ শোক, ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না; তাঁহারা দৈবের বৈচিত্র্যময় ঐন্দ্রজালিক বিধানে চমৎকৃত হইলেন। অতঃপর কবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে পর বাদশাহ প্রেরিত মুদ্রাদি গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপিত

(১) শাস্ত্রবিধি অনুসারে মুসলমান মাত্রেই মুসলমানের কবর দর্শনে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কিন্তু কথিত আছে যে, ফেরদৌসী অগ্নি-উপাসকদিগের প্রশংসা-সূচক অনেকগুলি কবিতা শাহনামায় লিখিয়াছিলেন বলিয়া একদা তাৎকালিক প্রসিদ্ধ তপস্বী মহাত্মা শেখ আবুল কাসেম খর্কাণী (ইহাঁর বিবরণ "তাজকেরাতল আউলিয়া" নামক পারস্য পুস্তকে দ্রষ্টব্য) তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা করেন নাই। তাহাতে পরবর্ত্তী রজনীতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, ফেরদৌসী স্বর্গে গৌরবের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। মহর্ষি তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া সেই পরমপদ লাভের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে কবি উত্তর করেন যে, "সর্ব্বশক্তিমান পরাৎপর পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব ও মহত্ত্ব বিষয়ে আমি যে সমস্ত কবিতা লিখিয়াছি, তৎপ্রভাবেই আমার এই সুখলাভ ঘটিয়াছে।"

হয়। মহাকবির একমাত্র দুহিতা ব্যতীত পুত্র বা অপর কোন পুরুষ তদীয় পরিবার মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। প্রাতবেশী মণ্ডলী সুলতান প্রেরিত পুরস্কার গ্রহণ বিষয়ক কথোপকথন প্রকাশ করিলে সেই কন্যা শোক-গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন যে, "আমি পিতার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। তিনি রাজাজ্ঞায় যে প্রকার কঠোরতম নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন, অপমান, অবিচার, অন্যায়াচরণ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের জানিতে বাকি নাই। তিনি জীবিতাবস্থায় যখন ন্যায্যাধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন, আশায় প্রতারিত হইয়াছেন, এই ধন ভোগ করিতে পারেন নাই, তখন আমরা ইহা লইয়া কি করিব? ইহা দর্শন করিয়া সেই নির্ব্বাপিত শোকানল পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া আমাদিগকে দ্বিগুণ শোকবিহ্বল করিতেছে এবং ভবিষ্যতে করিবে। সুতরাং শোকের কারণ যে ধন, তাহা গ্রহণ করা ত দূরের কথা, আমরা স্পর্শ করিতেও প্রস্তুত নহি।" বালিকার এই বেদনাব্যঞ্জক তেজোপূর্ণ বাক্য শ্রবণে সমবেত সকলে নীরব ও নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল, কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। কবির এক সহোদরা ছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বুদ্ধিমতী সুশীলা মহিলা

কহিলেন, "কন্যা যাহা বলিয়াছেন, যুক্তিবিরুদ্ধ কথা নহে। বাস্তবিক আজ উহা দর্শন করিয়াই আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া উহা প্রত্যর্পণ দ্বারা সুলতানের অসন্তোষ উৎপাদন করাও অকর্ত্তব্য; কেননা রাজ্যাধিপতির সম্মান রক্ষা করিতেও শাস্ত্রে বিধি আছে। সেই জন্য এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য, বলিতে বাসনা করিয়াছি, যদি যোগ্য বোধে সকলের মনোনীত হয়, কার্য্যে পরিণত করিবেন। দেখুন, মহামান্য গজনীপতি আমার ভ্রাতার জন্যই এই বিপুল বিভব প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা আমার ভ্রাতারই, ভ্রাতা ব্যতীত এ ধনে অন্য কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু লীলাময় জগদীশ্বরের বিচিত্র বিধানে আজ তিনি স্বর্গগত, সুতরাং এই ধন আর কে লইবে? ইহা এক্ষণে তাঁহার বাসনানুযায়ী কার্য্যে নিয়োগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে নদীর জল প্লাবিত হইয়া নগরের সমূহ ক্ষতি করিত দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণমনে বলিতেছেন, "যদি ঈশ্বরানুগ্রহে কখন ধনোপার্জ্জন করিতে পারি, তবে নগরবাসীদিগকে ক্লেশের হস্ত হইতে রক্ষা করিব,—প্রস্তর দ্বারা নদীপার্শ্বে এরূপ এক উচ্চ বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিব যে, নদী অতি

প্লাবিত হইলেও যেন নগরের কোন অনিষ্ট না করিতে পারে।" ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল; এই সঙ্কল্প সাধনোদ্দেশ্যেই তিনি গজনীশ্বরের কার্য্যে প্রবাসে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব এই অর্থ দ্বারা যাহাতে তাঁহার হৃদয়ের বাসনা আজ চরিতার্থ হয়, আশা পূর্ণ হয়, আপনাদিগকে তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিতেছি। যদি এ প্রস্তাব মনোনীত হয়, তবে আপনারা অর্থ রাশির যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন,আমাদের মতামতের কোনও আবশ্যক করে না।'

ফেরদৌসী-সহোদরা ইহা বলিয়া নীরব হইলেন। তাঁহার জ্ঞানী জনসুলভ সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব সকলেরই সন্তোষদায়ক হইল। তখন রাজকীয় অনুচরগণ এই তত্ত্ব বাদশাহের গোচর করিলেন। সদ্‌গুণশালী নরপতি কবির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে বৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন; কবির অলৌকিক গুণের ব্যাখ্যা করিয়া কতই অনুশোচনা করিলেন। রাজদরবার বিষাদপূর্ণ হইল; শত্রু মিত্র, জ্ঞানী মূর্খ, যুবা বৃদ্ধ সকলেই সন্তপ্ত হৃদয়ে হা-হুতাশ করিল। অতঃপর মহামান্য সুলতান ফেরদৌসী-দুহিতার তেজস্বিতার কথা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন; বৃক্ষের পরিচয় ফলেও পাইলেন। পরে কবির সহোদরার প্রস্তাবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাহা সম্পাদ-

নার্থ এবং তৎসহ নিজের অভিপ্রায়ানুযায়ী কবির স্মৃতি রক্ষার্থ অবিলম্বে লোক প্রেরণ করিলেন। যথাকালে বাদশাহের অনুমতিক্রমে কবির বাল্য জীবনের লীলা-নিকেতন তুস্ নগরের পাদপ্রবাহিতা নদীপার্শ্বে পর্ব্বত প্রমাণ এক সুবৃহৎ বাঁধ এবং অমর কবির স্মরণার্থ একটী প্রকাণ্ড অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। আজ প্রায় নয় শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, কালের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে পৃথিবীতে কত যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, কত স্থানে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কত শোভাসমৃদ্ধি-শালী নগর মহারণ্যে এবং অরণ্য নগরে পরিণত হই-য়াছে, কত শত সম্রাট সাম্রাজ্য সহ অনন্ত কাল-সমুদ্রে ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্বুদের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রাণ ফেরদৌসীর মহাপুণ্য বলে সেই সেতু ও পথিকা-শ্রমটী অবিনশ্বর পুণ্যস্তম্ভ স্বরূপ কালের বক্ষে আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া কবির প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র নামের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আর তাঁহার কবর? সেই পবিত্র পুরু-ষের পবিত্র সমাধি গোরস্থান তীর্থরূপে পরিণত হইয়া অসংখ্য যাত্রিক-হৃদয়ের সন্তোষ বিধান করিতেছে।